পুঁথির পাতার বর্ণ, শব্দ ও লিপি বৈচিত্র্য

অণিমা মুখোপাধ্যায়

(১)

আমরা যখন কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ের একটি বা একাধিক পুঁথি নিয়ে চর্চা করি, তখন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আলোচ্য পুঁথির বিষয়বস্তু, তার লিপিকাল, পুষ্পিকা (যদি কিছু থাকে), কবির সময়, পাঠ-পাঠান্তরের দিকেই গভীর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখি। কিন্তু পুঁথির এই বিষয়গত ভাবনা ছাড়াও, আরও অনেক বিষয় পুঁথি বিশেষজ্ঞদের ভাবায়—তা হলো পুঁথির পাতার বর্ণ-শব্দ-বানান ও লিপিকলার বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য। আলোচ্য বৈশিষ্ট্যগুলি দু-চারটি পুঁথিচর্চায় দৃষ্টি এড়িয়ে যেতেও পারে, কিন্তু দীর্ঘ অধ্যবসায়ে বহু পুঁথি মনোযোগ সহকারে পাঠ করলে, ধীরে ধীরে এই সব মূল্যবান বৈশিষ্ট্যগুলি নজরে পড়তে বাধ্য। পুঁথি বিশেষজ্ঞ রমাকান্ত চক্রবর্তীর একটি কথা এখানে স্মরণ করা যেতে পারে—'মনে রাখতে হবে, যে কোন পুঁথিই অত্যন্ত মূল্যবান। যত্ন করে পুঁথির প্রত্যেকটি অক্ষর, প্রত্যেকটি শব্দ পড়া দরকার। ...কেননা একটি পুঁথি থেকে শত শত জ্ঞান-পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়। উৎসারিত হয়, ইতিহাস, ভাষাতত্ত্ব, পদ্ধতি বিষয়ক জ্ঞান। এবং সর্বোপরি নির্মোহ বিচার বুদ্ধি। পুঁথি এক কথায় জ্ঞানের খনি।'

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যেমন পুঁথির অক্ষরের বিবর্তন দেখা যায়, দেখা যায় একই বর্ণ,কালের স্রোতে পরিবর্তিত হতে হতে তার রূপ ও অবস্থান বদল করে আমাদের জ্ঞানের ভাণ্ডারে আলোড়ন তোলে। আর যতক্ষণ পর্যন্ত তাকে একটা নিয়ম শৃঙ্খলায় বাঁধা না যায়, ততক্ষণ যেন স্থির হওয়া যায় না। বাংলা পুঁথির অনুস্বার বর্ণটি সম্পর্কে আমাদের এইরকমই অভিজ্ঞতা ঘটেছে। একদিকে যেমন প্রাচীন কাল থেকে ছাপা হরফ আবিষ্কারের পূর্ব পর্যন্ত এই হরফটি ক্রম-বিবর্তিত হতে হতে বিন্দু থেকে শূন্য আকারে পরিবর্তিত হয়ে বর্তমান রূপটি অর্জন করেছে, তেমনই বাক্য বা শব্দের মধ্যবর্তী এর অবস্থানের ক্ষেত্রে, এর যাযাবর চেহারাও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পরে আমরা এ-বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করব।

পুঁথি যাঁরা ভালোবাসেন, তাঁরা তার সঙ্গে তন্ন তন্ন করে পরিচয় সাধনে কখনো ক্লান্তি বোধ করেন না। আর এই পথেই তাঁদের সামনে খুলে যায় আর একটা নতুন জগৎ, তার লিপিকলার নানান খুঁটিনাটি বিষয়। এই সব বিষয় ছাড়াও পুঁথির পাতার বানানের নানা কৌতুককর দিকগুলিও বিশেষভাবে আলোচিত হওয়া প্রয়োজন। পুঁথির পাতার বানান সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, তিনি এককালে প্রাচীন বাংলা 'মন দিয়ে এবং আনন্দের সঙ্গেই' পড়েছিলেন এবং 'সেই সাহিত্যে যে সাধু বাংলায় প্রচলিত ক্রিয়াপদের অভাব লক্ষ' করেছিলেন, তাও উল্লেখ করেছিলেন। তাঁর মতে পুঁথির বানান উচ্চারণ অনুসারী বানান, অর্থাৎ phonetic। তাই তাঁর মনে হয়েছিল, 'প্রাচীন বাঙালী, বানান সম্বন্ধে নির্ভীক ছিলেন, পুরানো বাংলা পুঁথি দেখিলেই তাহা বুঝা যায়'। আমরা এই প্রাচীন পুঁথির বানান প্রসঙ্গে অন্যত্র আলোচনা করেছি।

পুঁথির পাতার বর্ণ বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে অনেক সময়েই দেখা যায়, পূর্ববর্তী বর্ণের প্রভাবে কীভাবে পরবর্তী বর্ণের চেহারার বদল সৃষ্টি হয়, কখনও বা দ্রুত লেখার তাগিদে কোনো কোনো শব্দ যুগ্ম আকার ধারণ করে অনেকটা যেন 'শাঁটলিপি'র আকার নেয়। এমন কি একই পুঁথিতে কোনো শব্দের দুটি বর্ণের একটি মিলিত রূপ যেন যুক্তাক্ষরের রূপ পায়। একেই আমরা শাঁটলিপি বলে অভিহিত করতে পারি। এই বিষয়টিও বিস্তৃত আলোচনার দাবি রাখে।

পুঁথির পাতার বর্ণ বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যায় সমরূপ বা প্রায় সমরূপ বর্ণ বা যুক্তবর্ণের শব্দগঠনের সময়ে পাশাপাশি অবস্থান-কালে একের গঠনগত চেহারা বা রূপাবয়ব অপরের ওপরে প্রভাব বিস্তার করে; শব্দ দুটিই তাদের গঠনগত শৈলীর সূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্য বর্জন করে সমাঙ্গ বা সমরূপ লাভ করে। এই ঘটনা যদি একটি বা দুটি ক্ষেত্রে মাত্র দেখা যেত, তাহলে এ নিয়ে ভাবনাচিন্তার কোনো প্রয়োজন হতো না। কিন্তু একাধিক ক্ষেত্রেই এর অস্তিত্ব দেখা যায়। অর্থাৎ প্রচুর পরিমাণ শব্দ বা বর্ণের ক্ষেত্রেই এটি লক্ষ করা যায় বলেই, পাঠ নির্ণয় ক্ষেত্রে অসুবিধে দেখা দেয়। এই অসুবিধে শুধু যে পাঠককেই বিভ্রান্ত করে তা নয়, লিপিকরকেও ভাবায়। অবশ্য পাঠকদের ভাবনা আর লিপিকরদের ভাবনার মধ্যে প্রকারগত ও প্রকৃতিগত তারতম্য অবশ্যই রয়েছে। পাঠকেরা এর দ্বারা বিভ্রান্ত হন, আর লিপিকরদের ভাবনা হচ্ছে কি উপায় অবলম্বন করলে, পাঠকদের এই সাদৃশ্য-জনিত বিভ্রান্তি থেকে দূরে রাখা যায়। কারণ পাঠক সম্পর্কে সচেতনতা, কম-বেশি সব লিপিকরের লেখাতেই প্রভাব বিস্তার করে থাকে। এই কারণেই সচেতন লিপিকর সমদৃশ্য বর্ণ বা যুক্তবর্ণের ক্ষেত্রে সচেতনভাবে লিপিতে এমন কোনো চিহ্ন ব্যবহার করবার চেষ্টা করেন, যাতে করে সমদৃশ্য বর্ণের

বা যুক্ত বর্ণের একটি থেকে অপরটিকে সহজেই পৃথক করা সম্ভব হয়। সাধারণত রূপান্তর, সংযোজন ও বিলুপ্তি অর্থাৎ পরিবর্তন, সংযোজন ও পরিবর্জন এই তিন প্রক্রিয়ায় এই কাজটি তাঁরা করে থাকেন। নীচে আমরা দু-একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি বোঝাবার চেষ্টা করব।

১. পুঁথির লিপিকলায় সমরূপ বর্ণের ও যুক্তবর্ণের মধ্যে কোনো একটিকে আকৃতি-গত দিক দিয়ে, অপরটির কোনো এক প্রত্যঙ্গের তুলনায় কমিয়ে অথবা বাড়িয়ে দিয়ে অবয়বগত সূক্ষ্ম রূপান্তর ঘটিয়ে সাদৃশ্যের অপনোদন করবার প্রয়াসকে বলা যেতে পারে, 'রূপান্তর প্রক্রিয়া।' যেমন ধরা যাক, পুঁথির লিপিতে 'স্ব' নির্দেশক যুক্ত বর্ণ এবং 'খ' বর্ণের পার্থক্য এতই সামান্য যে, অনেক সময়েই এদের স্বতন্ত্র করা কঠিন হয়ে ওঠে। ফলে অনেক পুঁথিতে দেখা যায়, লিপিকরেরা এই দুটি বর্ণের মধ্যে আকৃতিগত সূক্ষ্ম পার্থক্য সৃষ্টি করবার কারণে সর্বত্র 'খ হরফটির অবয়বে রূপান্তর ঘটিয়ে এই হরফের 'ভূমি'[১৮] থেকে 'মাত্রা' পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত খাড়া 'দণ্ড' টিকে ঋজু ভাবে অনেকটা ঊর্ধ্বোত্তোলিত করেছেন। যেমন খেলা ('খেলা') এবং স্বপ্ন ('স্বপ্ন')।

এখানে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে লিপিকর 'স্ব' এবং 'খ'কে পৃথক সত্তায় প্রকট করবার জন্য সচেষ্ট হয়ে 'খ'-এর দেহস্থ ডানভাগের খাড়া দণ্ডটির 'মাত্রা' সীমা অতিক্রম করে ঋজুভাবে অনেকটা ঊর্ধ্বোত্তোলিত করেছেন এবং এতে 'খ'-র পৃথক সত্তাও স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত হয়েছে। এখানে আরও একটি বিষয় মনে রাখা প্রয়োজন যে 'স্ব' অক্ষরের 'মাত্রা' রয়েছে এবং 'খ' অক্ষর মাত্রাহীন। কিন্তু 'খ' অক্ষরের বাঁ ও ডান এই দুটি অংশ যদি আকস্মিকভাবে জুড়ে যায় (যার একাধিক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।), তখন 'স্ব' ও 'খ' বর্ণের এই সূক্ষ্ম প্রভেদ দৃষ্টিগ্রাহ্য হওয়া কঠিন। ফলে পাঠ নির্ণয়ে গোলমাল সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। 'খ' বর্ণের এই রূপান্তরের আর একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে খেলিতেখেলিতে দেখেআচম্বিতে স্থানেরসাবকদুইচারি।
(খেলিতে খেলিতে দেখে আচম্বিতে স্থানের সাবক দুই চারি)।

২. পুঁথির লিপিকলায় 'তু' এবং 'ও'-এর আকৃতিগত কোনো পার্থক্য নেই। যেমন

হওকৃষ্ণতুমি (হও কৃষ্ণ তুমি)।

এই কারণেই অনেক পুঁথিতেই দেখা যায় সংশ্লিষ্ট লিপিকর দুই বর্ণের মধ্যে 'ও'-এর আকৃতিতে সূক্ষ্ম রূপান্তর ঘটিয়ে স্বাতন্ত্র্য মণ্ডিত করবার চেষ্টা করেছেন। যদিও 'তু' মাত্রা যুক্ত এবং 'ও' মাত্রাহীন। তবু, পুঁথির একটানা লিখিত পদ্ধতি জনিত লিপিকলার ক্ষেত্রে অনেক সময়েই 'ও' হরফটিও মাত্রা যুক্তভাবে লেখা হয় বলেই এই রূপান্তর

ঘটাবার প্রয়োজন দেখা দেয় যেমন— ('তু') ও (ও)। এখানে দেখা যাচ্ছে 'ও' হরফটির ক্ষেত্রে 'ভূমি' থেকে উর্ধ্বমুখ রেখাটি সামান্য মোচড় দিয়ে একেবারে মাথার উপরে অনেকটাই তুলে দেওয়া হয়েছে। 'ও' হরফের এই রূপান্তরের একটি নমুনা এখানে দেওয়া হলো—
(তরস্থ না হও তুমি এইখানে আছি আমি।)

কোনো-কোনো পুঁথিতে আবার 'তু' হরফটির তলায় একটি বিন্দু বসিয়ে এই বৃত্তাকার নির্ধারক চিহ্নটি দিয়েই একে 'ও' বর্ণ থেকে পৃথক ও বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত করে তোলা হয়েছে। দু-একটি নমুনা—
(তুমি বিষ্ণু তুমি কৃষ্ণ তুমি জজ্ঞেশ্বর)

বাংলা পুঁথির লিপিতে ড-উ-ড় সমরূপ বর্ণ। প্রাচীন বাংলা হরফে এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুঁথিতে 'ড়' অক্ষরের নীচের বিন্দুটি অনুপস্থিত ছিল এবং 'উ' হরফের 'চৈতন' ছিল না। অর্থাৎ এই বর্ণত্রয়ের গঠনগত কোনো পার্থক্য লক্ষ করা যায় না। ড-উ-ড় অক্ষর ত্রয়ের এই সাদৃশ্যগত প্রতিক্রিয়া থেকেই সম্ভবত পরবর্তীকালের বাংলা লিপিতে উ-এর মাথায় চৈতন এবং 'ড়'-এর ভূমিদেশে বিন্দুবৎ 'নির্ধারক চিহ্ন' যুক্ত হয়েছে। কোনো-কোনো পুঁথিতে এই তিনটি বর্ণের সাদৃশ্যগত প্রতিক্রিয়ায়, সংশ্লিষ্ট লিপিকর এই সব বর্ণের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার কারণে, এদের অবয়বে কিছু সূক্ষ্ম নির্ধারকচিহ্ন যুক্ত করেছেন। যেমন—'উ' হরফটির নীচে কোনো পুঁথিতে ভূমি বরাবর একটি তির্যক রেখা ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। আবার কোনো পুঁথির লিপিকর এই হরফটির মাথার উপরে একটি বৃহদাকার চন্দ্রবিন্দু-সদৃশ নির্ধারক চিহ্ন সংযুক্ত করেছেন। কেউ-বা এর মাথায় 'ঙ' হরফের মাথার পুটলির চিহ্ন ব্যবহার করেছেন।

'ড' বর্ণটির সঙ্গে যুক্ত নির্ধারক চিহ্নটি দেখা যায়, উক্ত বর্ণের যে রেখাটি 'মাত্রা' থেকে যাত্রা করে 'ভূমি' বরাবর পথে অগ্রসর হয়েই, ডানদিকে বাঁক নিয়ে যেখানে মোচড় খেয়ে অর্ধবৃত্তাকারের সৃষ্টি করে, সেই রেখাটির প্রথম ঋজু অংশের মধ্যভাগে, ভূমির সমান্তরাল একটি ছোটো অনুভূমিক রেখা যুক্ত করা হয়েছে। এই চিহ্নটি প্রাচীন অর্ধবাহু 'জ'-এর বাহুটির সদৃশ। যেমন— ('ড') এবং ('জ')। এই ক্ষুদ্র নির্ধারক চিহ্নটিই 'ড' বর্ণকে 'ড়' এবং 'উ' বর্ণ থেকে পৃথক করতে সাহায্য করে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুঁথিতে, 'জ' হরফটি আলোচ্য নির্ধারক চিহ্ন সমন্বিত 'ড' হরফটির সঙ্গে যে প্রায় অভিন্ন একথা আগেই বলা হয়েছে। যেমন, (জি) ও (ডাকে)। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই 'জ'-এর অর্ধবাহুই পরবর্তীকালে পূর্ণবাহু হয়েছে কিনা, অথবা পূর্ণ বাহু ও অর্ধ বাহু 'জ' একই সঙ্গে প্রচলিত ছিল কিনা, একথা আজ আর বলা সম্ভব নয়। এই

প্রসঙ্গে ডঃ তারাপদ মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্য এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে। '...তুলনামূলক আলোচনায় অক্ষরের প্রাচীনত্ব আধুনিকত্ব স্থির করা যায় তখনই, যখন লিপির ইতিহাসে প্রতিটি স্তরের বৈশিষ্ট্য স্থির হয়ে গেছে। কিন্তু বাংলা লিপির ইতিহাসে সব তথ্যই কি আমাদের হস্তগত হয়েছে? আমরা কি নিশ্চিত ভাবে জানি, উ-র চৈতন কবে থেকে শুরু হয়েছে? ড/ড়, য/য়, ণ/ন/ল কবে থেকে পৃথক হয়েছে, ণ-এর দ্বিবিধ রূপ কতদিন চালু ছিল, পূর্ণ বাহু এবং অর্ধ বাহু 'জ' একই সঙ্গে দীর্ঘকাল চালু ছিল, না অর্ধ বাহু পরবর্তীকালে পূর্ণ বাহু হয়েছে, বিন্দু যুক্ত 'র' প্রাচীন না পেট-চেরা 'র' প্রাচীন, ি-কারের ছত্রাকার কবে যুক্ত হল, দাঁড়ি অংশ কবে থেকে সৃষ্টি হল, দাঁড়ির উপর ছত্রাকার উর্দ্ধাংশ নিয়ে আধুনিক ি-কারের জন্ম কবে, 'কু'-র আধুনিক রূপ প্রথমে কবে পাওয়া গেল, আমরা কি এমন প্রমাণ সংগ্রহ করতে পেরেছি যে 'থ' 'খ' 'ষ' প্রভৃতি অক্ষরের 'কোণ' যুক্ত রূপ আধুনিক এবং কোণ-হীন অর্ধবৃত্তাকার রূপ প্রাচীন? বাঙ্গালা লিপির আঞ্চলিক ভেদ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা কতটুকু? আমরা জানি না, বাঙ্গালা আক্ষরের কোন্ প্রত্যঙ্গটি প্রাচীন, কোন্‌টি আধুনিক। লিপির ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান যখন এতই সীমাবদ্ধ, তখন এ-অক্ষরটি প্রাচীন, ও অক্ষরের ঐ-রেখাটি আধুনিক এমন স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়ার কোন অধিকার আমাদের নেই।'

কিন্তু তবু কিছুটা অনুমানের ভিত্তিতে বলা যায়, 'জ' হরফের এই 'অর্ধবাহু সদৃশ' নির্ধারক চিহ্নটি তখনই কার্যকর হওয়া সম্ভব, যখন 'জ' হরফের অর্ধবাহুর কাল শেষ হয়ে পূর্ণবাহু ব্যবহৃত হচ্ছে। কারণ প্রথমে পূর্ণ বাহুর প্রচলন হয়ে পরে অর্ধবাহুর প্রচলন কল্পনা অবাস্তব। কেননা 'জ' হরফের আধুনিক রূপ পূর্ণ বাহু যুক্ত। এই দিক দিয়ে বিচার করলে বলা যায় 'জ'-এর অর্ধবাহু পূর্ণবাহু অপেক্ষা প্রাচীনতর। সুতরাং ডঃ তারাপদ মুখোপাধ্যায়ের সব বক্তব্য এখানে নির্বিচারে মানা গেল না।

(২)

বাংলা অনুস্বার হরফ-এর অবয়ব ও অবস্থানের বিবর্ত্তন

অশোকের ব্রাহ্মীলিপিতে অনুস্বার হরফটিকে পাওয়া যায় একটি বিন্দুর আকারে, পূর্বস্থিত বর্ণের ডানপাশে একটু উপরের দিকে কাঁধ বরাবর অবস্থিত। আর আধুনিক বাংলায় পাই দুটি বর্ণের মাঝখানে, একটি বৃত্তের নীচে, একটি তির্যক রেখার সঙ্গে অভিন্ন আকারে। এই ব্রাহ্মীলিপির বিন্দুর বর্তমান অনুস্বার হরফে পরিণত হওয়ার মাঝখানে অনেকগুলি স্তর রয়েছে। এই বিবর্তনের ধারায় অন্তত চারটি পর্যায় লক্ষ করা যায়। এবং এর প্রতিটি পর্যায়েই অনুস্বার হরফটি বারবার রূপ ও স্থান পরিবর্তনের মাধ্যমে আজকের নির্দিষ্ট রূপে এবং নির্দিষ্ট স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বাংলা হরফ অনুস্বারের এই

বিবর্তন ধারাটির পিছনে, কেবলমাত্র ব্রাহ্মী থেকে বাংলায় বিবর্তনের কালানুক্রমিক পরিবর্তনের ইতিহাসটুকু নেই, রয়েছে আরও অতিরিক্ত কিছু। অর্থাৎ ব্রাহ্মীলিপির 'অনুস্বার' হরফটি কেবল কালানুসারী নবকলেবর পরিগ্রহণের মাধ্যমেই ক্রমে আধুনিক বাংলা লিপির 'অনুস্বার'-হরফ রূপে আত্মপ্রকাশ করেনি, এর পিছনে আরও কিছু কারণও বর্তমান রয়েছে। সে কারণটি জানতে হলে, শব্দ বা পঙ্‌ক্তিস্থিত অন্যান্য হরফ বা যুক্ত বর্ণের অনুষঙ্গে এই অনুস্বার হরফটির কালানুক্রমিক বিবর্তন ধারাটি অনুধাবন করতে হবে। সুতরাং অশোকের ব্রাহ্মীলিপির কাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত বাংলা অনুস্বার হরফটির যে বিচিত্র ও দীর্ঘ যাত্রা পথ, সেটি পর্যবেক্ষণ করলে তবেই বিভিন্ন সময়ে অনুস্বারের রূপ ও স্থান পরিবর্তনের কারণে যে এর পূর্বাপরস্থিত অন্যান্য হরফেরও বেশ কিছু অবদান রয়েছে, সেকথা স্পষ্ট হবে। বর্তমানে আমরা অনুস্বার হরফের বিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায় এবং তার কারণগুলি বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করব।

বিবর্তন ধারার প্রথম পর্যায় :

বাংলা লিপির আদি রূপ আমরা পাই অশোকের ব্রাহ্মীলিপিতে। সেখানে অনুস্বার হরফটি একটি বিন্দুর আকারে পূর্বস্থিত বর্ণের ডানদিকে একটু উপরে, অনেকটা কাঁধ বরাবর লেখা হত। যেমন[১]— (দোসং) ও (ইয়ং)।

এরপরে নবম-দশম খ্রিস্টাব্দে বাংলা লিপিতে উৎকীর্ণ কোনো কোনো শিলালিপিতে এই অনুস্বার পূর্বোক্ত ব্রাহ্মীলিপির মতোই একটি বিন্দুর আকারে পাওয়া গেলেও, সেখানে তার অবস্থানের পরিবর্তন বিশেষভাবে লক্ষণীয়। পূর্বোক্ত ব্রাহ্মীলিপির অনুস্বার বিন্দুটি যেখানে পূর্বস্থিত বর্ণের ডানদিকের উপরে, অনেকটা কাঁধ বরাবর লেখা হত, সেখানে পরবর্তীকালের এই সব শিলালিপিতে অনুস্বারটির অবস্থান দেখা যায় একেবারে পূর্বস্থিত বর্ণের উপরে ঠিক মাঝখানটিতে। যেমন[২]— (য়ং)।

দশম শতকের তারিখ সংবলিত দুটি মাত্র পুঁথির খবর পাওয়া যায়। ৯৭৯-৮০ খ্রিস্টাব্দে অনুলিখিত 'অষ্টসহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা'র পুঁথি[৩] এবং প্রথম মহীপালের রাজত্বের ষষ্ঠ বর্ষ অর্থাৎ ৯৮০-৮১ খ্রিস্টাব্দে অনুলিখিত একটি নামহীন পুঁথি।[৪] আলোচ্য পুঁথি দুখানিতে আমরা অনুস্বারকে পূর্বস্থিত বর্ণের মাথায়, বিন্দুর আকারে অবস্থিত দেখি।

এর পরে দ্বাদশ শতকের তারিখ সংবলিত পুঁথির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ১১২৫ খ্রিস্টাব্দে লিপিকৃত পুঁথি 'কালচক্রাবতার'[৫] এবং ১১৯৯ খ্রিস্টাব্দে লিপিকৃত পুঁথি 'পঞ্চাকার'।[৬] এই পুঁথি দুখানিতেও আমরা অনুস্বারকে বিন্দুর আকারে পূর্বস্থিত বর্ণের

মাথার উপরে অবস্থিত হতে দেখি। যেমন—

(১. দেবীনাং, ২. গরলং, ৩. বালাং, ৪. অং অঃ)

ত্রয়োদশ শতকে লিপিকৃত পুঁথির মধ্যে ১২৮৯ খ্রিস্টাব্দে লিপিকৃত 'পঞ্চরক্ষা' পুঁথি খানির উল্লেখ করা যায়। এর লিপির সঙ্গে পূর্বোক্ত 'কালচক্রাবতার' পুঁথির লিপির বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই বলে লিপিবিদরা মনে করেন।

এরপরেই আমরা একেবারে পঞ্চদশ শতকে চলে আসব। পঞ্চদশ শতকের তারিখ সংবলিত তিনখানি পুঁথির লিপির কথা এখানে উল্লেখ করা যায়। ১৪৪৩ খ্রিস্টাব্দে লিপিকৃত 'কালচক্রতন্ত্র', ১৪৮৯ খ্রিস্টাব্দে লিপিকৃত 'ধর্মরত্ন' এবং ষোড়শ শতকের একেবারে প্রথমে অর্থাৎ ১৫০৬ খ্রিস্টাব্দে লিপিকৃত 'মিতাক্ষরা' পুঁথি। আলোচ্য তিনটি পুঁথিতেই অনুস্বারের পরিবর্তন বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এখানে অনুস্বার হরফটি আর কেবলমাত্র একটি বিন্দুর আকার বিশিষ্টই নয়, কলমের সযত্ন প্রয়াসে সেটি বৃত্তাকারে সুগঠিত 'শূন্য'-র আকার ধারণ করেছে।

ব্রাহ্মীলিপির 'বিন্দু' এখন হয়ে পড়েছে সযত্ন প্রয়াসে সৃষ্ট 'বৃত্ত'।[৮] যেমন ১. (প্রবন্ধং), 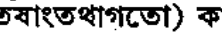 (তেষাংতথাগতো) কালচক্রতন্ত্র ১৪৪৬ খ্রিস্টাব্দ। ২. (তিমিরগ্রস্ত গ্রহণং), (প্রথমাং), (শ্রীবটক সিংহ) ধর্মরত্ন, ১৪৮৯ খ্রিস্টাব্দ। ৩. (মহাপাতকাদি নিমিত্ত পরিগণনং), (বানপ্রস্থকরনং) মিতাক্ষরা ১৫০৬ খ্রিস্টাব্দ।

অবশ্য অবস্থানগত দিক দিয়ে এখানেও অনুস্বার পূর্বস্থিত বর্ণের ঠিক মাথার উপরে স্থিত হলেও, সে এখন অনেকখানি স্থান দখল করে নিয়েছে। সেই দিক দিয়ে বলা যায় এই স্তরের লিপিতে অনুস্বারের আকারগত এবং অবস্থানগত পরিবর্তন লক্ষ করবার বিষয়। এই প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুঁথির লিপির কথাও উল্লেখযোগ্য। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুঁথিখানি তারিখ সংবলিত না হওয়ায় এর সময় সম্পর্কে পণ্ডিতেরা একমত নন।[৯] তবে ১৪৩৫ খ্রিস্টাব্দে লিপিকৃত 'বোধিচক্রাবতার' পুঁথির লিপির সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায়, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কোনো কোনো হরফ 'বোধিচক্রাবতারে'র পূর্ববর্তী, আবার কোনো কোনো হরফ পরবর্তী। সেই হিসাবে এর লিপিকাল পঞ্চদশ শতকের বলে অনেকে মনে করেন। যাই হোক, এই পুঁথির লিপিতেও অনুস্বার হরফটি আর কেবলমাত্র একটি বিন্দুর আকার বিশিষ্ট নয়। কলমের সযত্ন প্রয়াসে সৃষ্ট বৃত্তাকারে সুগঠিত 'শূন্য'-র আকারে আত্মপ্রকাশ করেছে। যেমন— (নিরন্তরং)।

অর্থাৎ এই পর্যায়ে আমরা অনুস্বার-এর আকারগত পরিবর্তন, 'বিন্দু' থেকে 'বৃত্ত' হতে দেখলাম।

বিবর্তন ধারার দ্বিতীয় পর্যায় :

অনুস্বার হরফটি বিন্দু থেকে বৃত্তে পরিণত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একদিকে যেমন এর আকারগত পরিবর্তন, এর ভালোভাবে মূর্ত হয়ে উঠবার সহায়ক হয়ে ওঠে, অন্যদিকে আবার তেমনই এর অবস্থানগত সমস্যাকে ডেকে নিয়ে আসে। পঞ্চদশ শতকের পরবর্তী কালের বহু বাংলা পুঁথিতেও এর প্রমাণ মেলে। দু-একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি স্পষ্টভাবে দেখানো যেতে পারে। যেমন—**সংকীর্তন** (সংকীর্তন), **সংসার** (সংসার), **এং** (এবং)। এখানে 'অনুস্বার' তার নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করলেও পরবর্তী **বিংশাতি** (বিংশতি), **সিংহসার** (সিংহসার), **সিংগাসনে** (সিংহসনে) ইত্যাদির ক্ষেত্রে 'ই' কারের ছত্রাকার চৈতন 'অনুস্বার'কে কখনও পরবর্তী অক্ষরের মাথার উপরে অবস্থান করিয়েছে, অথবা দুটি বর্ণের মাঝে ব্যবধান ঘটিয়েছে।

পঞ্চদশ শতকের একেবারে শেষে (১৪৮৯খ্রি.) অনুলিখিত পুঁথি 'ধর্মরত্ন' থেকে সংগৃহীত[১০] উপরোক্ত প্রথম উদাহরণ-চিত্রগুলি লক্ষ করলে দেখা যাবে, প্রথম শব্দ 'গ্রহণং'-এর 'ণ'-এর উপরে বৃত্তাকার অনুস্বারের অবস্থান কোনো সমস্যার সৃষ্টি না করলেও, দ্বিতীয় শব্দ 'সিংহ' লিখতে গিয়ে 'ি'-কার যুক্ত 'স'-এর ঠিক মাথা বরাবর সোজাভাবে 'মাত্রা'র উপরে অনুস্বার বৃত্তের অবস্থানে সমস্যা দেখা দিয়েছে। কারণ 'ি'-কার সেখানে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ অন্যত্র, যেমন 'গ্রহণং' বা 'প্রথমাং' শব্দে অনুস্বার-এর পূর্ববর্তী বর্ণ 'ণ'-বা 'মা'-এর মাথার উপরে অনুস্বার বৃত্তের স্থিত হবার কোনো বাধা না থাকায়, সে স্থানচ্যুত হয়নি। অর্থাৎ সেখানে সাধারণ নিয়মের কোনো ব্যতিক্রম ঘটেনি। কিন্তু 'সিংহ' লিখতে প্রচুর সমস্যা দেখা দেওয়ায়, এক্ষেত্রে অনুস্বার বৃত্তটিকে স্থানচ্যুত করে একটু ডানদিকে সরিয়ে 'ি'-কারের ছত্রাকার চৈতনটির সীমার বাইরের এলাকায় সরিয়ে স্থিত করতে হয়েছে। আর অনুস্বারের এই অবস্থানগত পরিবর্তনের পিছনে লিপির বিবর্তনগত কোনো রকম কারণ বর্তমান নেই, রয়েছে বাস্তব অসুবিধা। এবং সে সমস্যার সমাধান লিপিকরদের দ্বারাই সাধিত হয়েছে, আর একটি উদাহরণ দেওয়া যাক।

হংস (হংস), **সংসার** (সংসার), **সিংহ** (সিংহ)

চিত্র - ২

ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধে অনুলিখিত একটি পুঁথি[১১] থেকে সংগৃহীত উপরোক্ত দ্বিতীয় উদাহরণ-চিত্রের নমুনা তিনটি লক্ষ করলে দেখা যাবে, 'হংস' ও 'সংসার' শব্দ দুটিতে 'হ' এবং 'স'-এর মাথার উপরে অনুস্বারবৃত্তের অবস্থানে কোনো সমস্যার সৃষ্টি হয়নি।

কিন্তু 'সিংহ' লিখতে গিয়ে ই-কার যুক্ত 'স'-এর মাথার উপরে অনুস্বার বৃত্তের অবস্থান অসম্ভব হওয়ায় সমস্যার সৃষ্টি করে। তাই অনুস্বার বিন্দুকে 'সি'-এর ছত্রকার চৈতনটির সীমা ছাড়িয়ে অনেকটা ডানদিকে অবস্থান করতে হয়। আরও একটি উদাহরণ সংগ্রহ করা যাক।

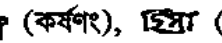

চিত্র - ৩

উপরোক্ত তৃতীয় উদাহরণ চিত্রটিও ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধে (১৫২৬ খ্রিঃ) অনুলিখিত একটি পুঁথি[১২] থেকে সংগৃহীত। আলোচ্য চিত্রটি পর্যবেক্ষণ করলেও দেখা যাবে, প্রথম ক্ষেত্রে 'কর্ষণং' শব্দটি লেখবার সময়ে বৃত্তাকার অনুস্বারের পূর্বস্থিত হরফ 'ণ'-এর মাথার উপরে স্বচ্ছন্দে অবস্থান কোনো সমস্যার সৃষ্টি করেনি। কিন্তু দ্বিতীয় উদাহরণের 'হিংসা' শব্দে ই-কার যুক্ত 'হ' হরফের মাথার উপরে সোজাসুজিভাবে অনুস্বার-এর অবস্থান অসম্ভব হওয়ায় সমস্যা দেখা দেয়। এর ফলে অনুস্বারের বৃত্তটি একটু ডানদিকে সরে গিয়ে 'ি'-কারের ছত্রাকার চৈতনটির সীমানা ছেড়ে দিয়ে, নির্দিষ্ট স্থান থেকে সরে একটু দূরে অবস্থান গ্রহণ করেছে।

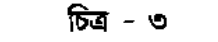

চিত্র - ৪

চিত্র - ৫

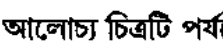

অনুস্বারের এই স্থান পরিবর্তন যে বাস্তব অসুবিধা তথা সমস্যা এড়াতেই, তা বোঝা যাবে উপরোক্ত চতুর্থ এবং পঞ্চম উদাহরণ-চিত্রের[১৩] দিকে লক্ষ করলে। সেই সঙ্গে অনুস্বারের অবস্থানগত এই বিষয়টি যে একেবারে আকস্মিক নয়, এটি যে একটি স্থায়ী সমস্যা, আশা করা যায় তাও আমরা উপলব্ধি করতে পারব। চতুর্থ উদাহরণ চিত্রের, 'সংসার', 'সংকীর্ত্তন', 'সংক্ষেপ', 'কংশে', 'সংমুখ' বা 'এবং' শব্দগুলিতে অনুস্বার বৃত্তটি পূর্ববর্তী হরফ 'স', 'ক' বা 'ব'-এর মাথার উপরে সোজাসুজিভাবে অবস্থান করলেও, পঞ্চম উদাহরণ চিত্রের 'সিংহ', 'সিংহমহাবলী', বা 'বিংশতি' শব্দগুচ্ছের ক্ষেত্রে তা সম্ভব হতে পারেনি। সেখানে আবার বাস্তব অসুবিধাজনিত সমস্যা এড়াতে অনুস্বারবৃত্ত শব্দগুলির 'ি'-কার এর ছত্রাকার চৈতনের নির্দিষ্ট সীমাবহির্ভূত এলাকায় সরে এসে অবস্থান করেছে। অনুস্বার বৃত্তের অবস্থানগত এই বাস্তব অসুবিধা

এড়াতে, পরবর্তীকালের বাংলা পুঁথিতে অনুস্বার বৃত্তের অবস্থান, কোথাও নির্দিষ্ট স্থানে, পূর্বস্থিত হরফের মাথার উপরে, আবার কোথাও-বা বাস্তব অসুবিধার শিকার হয়ে নিয়মের ব্যতিক্রম ক্রমে একটু ডানদিকে সরে অবস্থিত হওয়ার পরিবর্তে, অনুস্বার বৃত্তের অবস্থানেরই পরিবর্তন ঘটানো হয়।[১৪] অর্থাৎ 'ি'-কার বিহীন শব্দের ক্ষেত্রেও অনুস্বার বৃত্তটি পূর্বস্থিত বর্ণের উপরে না বসে, একটু ডানদিকে সরে এসেই অবস্থান গ্রহণ ক'রে, তার স্থান নির্দিষ্ট করে। যেমন[১৫]—

(ক.বি.সং, ৬৩৬৭)

(ক. বি. সং, ৬৮৭৮)

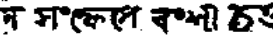 (ক. বি. সং, ৬৭০৪)

(ক. বি. সং, ৬৭০০) সুতরাং এই পর্যায়ে আমরা অনুস্বার বৃত্তের অবস্থানগত বিবর্তন দেখতে পেলাম।

বিবর্তন ধারার তৃতীয় পর্যায় :

অনুস্বার বর্ণের বিবর্তন ধারার দ্বিতীয় পর্যায়ে নানা কারণে অনুস্বার বৃত্তটিকে, তার নির্দিষ্ট স্থান, পূর্বস্থিত বর্ণের মাথা বরাবর অবস্থান থেকে স্থানচ্যুত হয়ে ডান পাশে সরে এসেও, কোনো নির্দিষ্ট আবাস স্থল না হওয়ায় দীর্ঘকাল ধরে ঘন ঘন অবস্থান পরিবর্তন করে, অনেকটা যেন যাযাবর অবস্থায় থাকতে হয়। অনুস্বারের এই যাযাবর অবস্থান কোনো কোনো সময়ে এমনই আকার ধারণ করেছিল যে, অনেক পুঁথিতে অনুস্বার হরফটিকে আমরা পরবর্তী হরফের মাথার উপরেও অবস্থিত হতে দেখি। যেমন— (অংস) 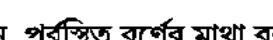 (সিংহ) (নরসিংহ)। শব্দ তিনটি লক্ষ করবার মতো। এই অনির্দিষ্ট অবস্থান কাল চলতে থাকে প্রায় তিন শতাব্দী কাল ধরে।

বাংলা লিপিতে অনুস্বার বৃত্তের এই এক অবস্থান থেকে অন্য অবস্থানে সরে যাবার ক্রমধারার সংবাদ পাওয়া যায়, বিভিন্ন সময়ে লিপিকৃত পুঁথির অক্ষর পর্যবেক্ষণ করলে। শুধু তাই নয়, একই পুঁথিতে বিভিন্ন কারণে এই অনুস্বার হরফটির বিভিন্ন স্থানে অবস্থানও লক্ষ করা যায়। আবার এই অবস্থানগত পরিবর্তনের কারণও মোটেই দুর্লক্ষ নয়।

অনুস্বার বৃত্তের এই অবস্থানগত পরিবর্তন ধারার এই তৃতীয় পর্যায়ে, আমরা দ্বিতীয় পর্যায়ের সেই একটু ডানদিকে সরে আসা অবস্থান এবং সেই পরিবর্তিত অবস্থান থেকেও বিচ্যুত হবার কারণগুলি অনুসন্ধানের চেষ্টা করব।

একটু আগেই লক্ষ করা গেছে যে, পূর্বস্থিত বর্ণের মাথা বরাবর সোজা উপর থেকে, অনুস্বার বৃত্তটি একটু ডানপাশে সরে এসে অবস্থান করে এবং বাস্তব কারণেই তা রীতিসিদ্ধও হয়ে পড়ে। তবু এই স্থান থেকেও অনুস্বারকে আবার সরে গিয়ে নতুন অবস্থান খুঁজে বেড়াতে হয়। এখন এই নতুন অবস্থানেও স্থিত হতে না পারবার কারণ, উদাহরণের সাহায্যে বিশ্লেষণ করে দেখানো যাক।

এখানে একই শব্দ 'সিংহ'-এর অনুস্বার কীভাবে বারবার স্থান পরিবর্তন করেও কোথাও স্থিত হতে পারেনি, তা লক্ষ করা যায়। এ পর্যন্ত অনুস্বার একটি হরফ হওয়া সত্ত্বেও সর্বত্রই অন্য কোনো হরফের মাত্রাস্থানের উপরেই তার অবস্থান ছিল। কিন্তু অনুস্বারের বিবর্তনের এই তৃতীয় পর্যায়ে এসে, এর অবস্থার এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটল। এই পর্যায়ে অনুস্বার বৃত্তটি মাত্রাস্থলে অবস্থান দখল করে বাংলা লিপিতে প্রথম পাঙ্‌ক্তেয় হয়ে উঠল। এই পর্যায়ে এসে অনুস্বার আর নিজে সরে গিয়ে অন্যকে জায়গা করে দিল না। অনুস্বার বৃত্তটির জন্যই পার্শ্ববর্তী পূর্বস্থিত অথবা পরস্থিত অন্যান্য হরফকে প্রয়োজনমতো জায়গা ছেড়ে দিতে হল। এই পর্বে তাই 'মাত্রা'-বর্তী অনুস্বার বৃত্তের অবস্থানঘটিত কারণেই অনুস্বারের পূর্ব ও পরবর্তী দুটি হরফের মাঝখানে একটি চক্ষুগ্রাহ্য ব্যবধানের সৃষ্টি হল। এবং সেই সঙ্গে অনুস্বারের দীর্ঘ যাত্রাপথে ক্রম-পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সে নিজের একটি নির্দিষ্ট এবং মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান খুঁজে পেল।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, অধিকাংশ প্রাচীন বাংলা পুঁথিতে প্রতিটি ছত্রে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত শব্দ বা পদগুলির মধ্যে কোনো রকম ফাঁক না রেখে একাদিক্রমে লিখিত হত। আর অপাঙ্‌ক্তেয় নয় বলেই এই পর্বে অনুস্বার বৃত্তটির জন্য পঙ্‌ক্তি মধ্যে একটি নির্দিষ্ট স্থান ছেড়ে দেওয়া শুরু হল। যেমন, নীচের উদাহরণটি লক্ষ করলেই বিষয়টি আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে। 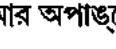 (সংহতি), (সংহার), 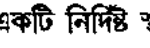 (সংকীর্তনে), 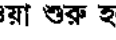 (সংক্ষেপ)।

এখন 'মাত্রা' স্থলে অনুস্বারের নতুন অবস্থানটি নির্দিষ্ট হল। কিন্তু আবার নতুন করে কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে হল। মাত্রাবর্তী অনুস্বার বৃত্তটির জন্য মর্যাদাপূর্ণ স্থান ছেড়ে দিতে গিয়ে, অনেক সময়ই পরবর্তী হরফের ক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ আকৃতগত পরিবর্তন তথা বিকৃতিও ঘটাতে হয়েছে। যেমন— (সিংহ), 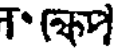 (সংহতি)।

বিভিন্ন পুঁথি থেকে উদ্ধৃত এই 'সিংহ' শব্দটিকে লক্ষ করলে দেখা যাবে 'স' এবং 'হ'-এর মধ্যবর্তী মাত্রাস্থলে অবস্থিত অনুস্বার বৃত্তটিকে রাখবার ফলে, শেষ পর্যন্ত 'হ' হরফটি যাতে 'হ্ন' হয়ে না ওঠে, সে সম্পর্কে লিপিকরদের মনে ভাবনা দেখা দেয়। কারণ কোনো কোনো পুঁথিতে সেরকম হবার দৃষ্টান্তও পাওয়া যায়। তাই এর হাত থেকে রক্ষা পেতে কোনো কোনো লিপিকর অনুস্বার বৃত্তের পরে 'হ' হরফ থাকলে এই 'হ' হরফের মাথায় একটি ছোট্ট সরল চৈতন লাগিয়ে একে 'হ্ন' থেকে পৃথক করে রাখবার সযত্ন প্রয়াস দেখিয়েছেন। কিন্তু সেই একই পুঁথির পাতায় যেখানে 'হ' হরফের পূর্বে অনুস্বার বৃত্তের অবস্থান নেই, সেই সব শব্দের ক্ষেত্রে 'হ' হরফটি তার স্বাভাবিক পূর্ণাঙ্গ আকারেই লিখিত হতে দেখি। যেমন (মহা) মহা শব্দস্থিত 'হ' হরফটি। অথবা যাহার (যাহার) শব্দস্থিত 'হ' হরফটি। আবার কোনো কোনো পুঁথিতে লক্ষ করা যায় 'হ' হরফের পরবর্তী মাত্রাস্থিত অনুস্বারকে নিয়েও সমস্যা দেখা দেয়। যেমন অনেক প্রাচীন পুঁথিতেই 'জু' লেখা হত 'হ্ন' এইভাবে। যেমন যুদ্ধ (যুদ্ধ) (ক.বি.সং. ৬৮৫৯) যুগল (জুগল), যুগধর্ম্ম (জুগধর্ম) (ক. বি. ১০৪৪), যুড়াব (জুড়াব), (ক. বি. সং. ৩০৯৮), যুগতি (জুগতি) আবার দেখা যায় যুকতি (জুকতি) কিন্তু হংসি (হংসি), হৃষ্ট (হৃষ্ট) ইত্যাদি। এইসব পুঁথির[১৬] ক্ষেত্রে দেখা যায় 'হং' অক্ষরটিকে 'জু' বা 'হ্ন' অক্ষরের সঙ্গে পৃথক করতে হলে বিষয়ের অর্থাৎ শব্দের অর্থের দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। যা লিপিকরের মোটেই অভিপ্রেত হতে পারে না। এই সব পুঁথির ক্ষেত্রে দেখা যায় লিপিকরেরা বিব্রত বোধ করে অনেক ক্ষেত্রে অনুস্বারের উপরে ছোট্ট একটি মাত্রা যুক্ত করেছেন। যেমন— বন্দেহ্ন (বন্দেহং) (ক. বি. সং. ১০৪১)। আবার কখনো-বা 'জু' হরফটির চেহারায় সামান্য পরিবর্তন এনে তাকে 'হং'-থেকে পৃথক করতে চেয়েছে। যেমন সংজুগে (সংজুগে)।

এতো গেল মাত্রাস্থিত অনুস্বারের পরবর্তী হরফের পরিবর্তন তথা বিকৃতি। আবার মাত্রাস্থিত অনুস্বারের কারণে অনেক পুঁথিতেই পূর্ববর্তী হরফের পরিবর্তন তথা বিকৃতি ঘটতে দেখা যায়। যেমন— সবংসে (সবংসে), কথা (কথা), কংস (কংস)।

এখানে 'কথা' শব্দটির 'ক' আর 'সবংসে' শব্দের 'বং'-এর মধ্যে পার্থক্য খুঁজে বার করা কঠিন। আবার কথা শব্দ-চিত্রস্থ 'ক' হরফের ডানদিকের বৃত্তাংশটিকে অর্থাৎ 'ক'-এর পুঁটুলিটিকে স্বাভাবিক 'ক'-এর আকারে লিখতে গেলে 'বংসি' শব্দ-চিত্রস্থ 'বং'

অংশটুকুর সদৃশ হয়ে যেতে পারে, যা লিপিকরের মোটেই অভিপ্রেত নয়। আবার 'সবংসে' শব্দটিরও 'বং', 'ক'-এর অনুরূপ হয়ে যাওয়াতে কোনো কোনো লিপিকর সমস্যার সমাধান করে   (ক) হরফের বিকল্প আদলটিকেই   (ক) বেছে নিয়েছে। যেমন পূর্বোলিখিত 'কংস'। সুতরাং দেখা যাচ্ছে অনুস্বার বৃত্তের এই অবস্থানগত সমস্যা পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী উভয় দিকের হরফকেই কম-বেশি পরিবর্তিত করে ফেলেছে।[১৭] এর ফলে মাত্রাস্থলে স্থিত অনুস্বার বৃত্তটিকে পরবর্তীকালের বাংলা পুঁথিতে আবার মাত্রাস্থল ছেড়ে কিছুটা নিম্নগামী হতে দেখা যায়। এই স্থান পরিবর্তনের পিছনে আবার একটি মনস্তাত্ত্বিক কারণও থাকা অসম্ভব নয়। সেটি হল, মাত্রাস্থলে স্থিত অনুস্বার বৃত্তটির নীচে ভূমি[১৮] বরাবর পঙ্‌ক্তিস্থিত অন্যান্য হরফের স্বাভাবিক নিম্নসীমা পর্যন্ত পড়ে থাকা এক চক্ষুগ্রাহ্য শূন্য স্থান লিপিকরদের মতে অসামঞ্জস্য মনে হওয়ায়, তাঁরা এই অনুস্বার বৃত্তটিকে একটু নীচে নামিয়ে অবস্থান ঘটিয়ে একটা সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টাও করে থাকতে পারেন। তাই যেসব ক্ষেত্রে বাস্তব অসুবিধা দেখা দেয়নি, সেসব ক্ষেত্রেও এই অনুস্বার বৃত্তটিকে 'মাত্রা' ও ভূমির প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় অবস্থান ঘটিয়েছেন। যেমন—   (কংস),   (সংশার) ইত্যাদি।

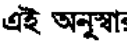

কিন্তু ভূমি ও মাত্রাস্থলের মধ্যবর্তী স্থানেও অনুস্বারের অবস্থান নির্দিষ্ট হতে পারেনি। এর কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, প্রাচীন বাংলা পুঁথিতে অনেক ক্ষেত্রেই[১৯] 'র'-এর রূপ দেখা যায় । এই সব ক্ষেত্রে লিপিকর অনুস্বার বৃত্তকে মাত্রা ও ভূমির মাঝখানে স্থাপন করতে গিয়ে 'রং' শব্দটি 'রঙ' রূপে না লিখে 'রং' এই রূপে লিখতে গেলে আবার নতুন করে সমস্যায় পড়লেন। কারণ ('রং') ও   ('বংসি')-র 'বং' এবং রং-এর সূক্ষ্ম পার্থক্য অনেক ক্ষেত্রেই দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে বৃত্ত-সদৃশ এই অনুস্বার হরফটি বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন পরিবর্তিত অবস্থান গ্রহণ করেও, কোনো পর্যায়েই কোনোরকম সমস্যার সম্মুখীন না হয়ে, বাধামুক্ত অবস্থায়, পূর্ণ মর্যাদায়, কোথাও স্থিত হতে পারেনি। প্রথম দিকে অপাঙ্‌ক্তেয় এই অনুস্বার এক সময়ে পাঙ্‌ক্তেয় হয়েও, মাত্রা এবং ভূমি পরিব্যাপ্ত আকার প্রাপ্ত না হওয়ায়, মাত্রাবতী অনুস্বারকে অনেক সময়েই পার্শ্বস্থিত অন্য কোনো হরফের সঙ্গীভূত হতে হয়েছে। আবার কোথাও সে নিজে পূর্বস্থিত অথবা পরস্থিত হরফের বিকৃতির কারণ হয়ে সমস্যার সৃষ্টি করবার কারণে, একটি স্বতন্ত্র বর্ণ হয়েও এই হরফটি কখনও অন্যান্য হরফের পাশে নিঃসঙ্কোচে অবস্থান করতে না পেরে, অসবর্ণ সদৃশ অবস্থাতেই থেকে গিয়েছে।

বিবর্তন ধারার চতুর্থ পর্যায় : বিভিন্ন সময়ে নানান অসুবিধা অপনোদনের কারণে বিভিন্ন রকমের অবস্থানগত পরিবর্তন ঘটিয়েও, অনুস্বার বৃত্তটির নির্দিষ্ট স্থানে নিঃসঙ্ক অবস্থান ঘটানো যখন কোনোভাবেই সম্ভব হল না, তখনই কোনো এক সময়ে[২০] কোনো এক পর্যায়ে অনুস্বারের 'নির্ধারক চিহ্ন'[২১] হিসাবে একটি তির্যক রেখা এই অনুস্বার বৃত্তের নীচে অবস্থান গ্রহণ করল। এই তির্যক রেখাটিকে গ্রহণ করতে গিয়ে অনুস্বার আবার ভূমি-মাত্রার মধ্যবর্তী স্থল পরিত্যাগ করে, পূর্ববর্তী পর্যায়ের মাত্রাস্থানে ফিরে গেল। অর্থাৎ মাত্রাস্থলবর্তী যে অনুস্বার বৃত্ত, তারই নীচে ভূমি বরাবর পড়ে থাকা শূন্য স্থানটিতে এই তির্যক রেখাটি স্থান দখল করে নিল। যেমন সংকীর্তন (সংকীর্তন)। এই তির্যক রেখাটি আজ আর আধুনিক বাংলা হরফ অনুস্বারের অঙ্গ বহির্ভূত নয়। এটি আজকের অনুস্বার হরফের একান্ত নিজস্ব প্রত্যঙ্গ হিসাবে গণ্য। অনুস্বারের নির্দিষ্ট অবস্থানগত বাধা এবং সেইসঙ্গে এক চক্ষুগ্রাহ্য শূন্যতা থেকে মুক্তি লাভ করতেই এই তির্যক রেখার আবির্ভাব ও অবস্থান, অনুস্বার হরফের স্থায়ী রূপ এবং অবস্থানকে নির্দিষ্ট করতে সাহায্য করেছে।

ব্রাহ্মীলিপির বিন্দু আকার থেকে যে অনুস্বারের বিবর্তনের পথে যাত্রা, শূন্যাকারের তির্যক রেখার সংস্থাপনে সে যাত্রার সমাপ্তি, এবং সকল সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান। প্রথম স্তরের বিন্দু থেকে বৃত্তে রূপান্তর না ঘটলে হয়তো একে এক দীর্ঘ পথ অনির্দিষ্টভাবে পরিক্রমণ করতে হত না। কারণ নাগরী লিপিতে, পূর্বস্থিত বর্ণের মাথা বরাবর সোজাভাবে বিন্দু-সদৃশ অনুস্বারটি কিন্তু আধুনিক কাল পর্যন্ত কোনো সমস্যার সৃষ্টি না করে কোনো বিবর্তনের মধ্যে না গিয়ে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

(৩)

আপাত অনাবশ্যক 'রেখ'-এর ব্যবহার

বাংলা ভাষায় 'রেফ' চিহ্নটি 'র' নির্দেশক হিসেবেই ব্যবহৃত। কোনো ব্যঞ্জন বর্ণের পূর্বস্থিত 'র', সেই বর্ণের মাথায় 'রেফ' হয়ে বসে। বাংলা পুঁথির পাতায়ও 'রেফ'-এর এই রকম ব্যবহার রয়েছে। সেখানে এই 'রেফ' চিহ্ন প্রধানত দুই ভাবে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। প্রথমত বিশুদ্ধ শব্দের অঙ্গীভূত হিসেবে 'রেফ' চিহ্নের বিশুদ্ধ ব্যবহার। দ্বিতীয়ত শব্দের উচ্চারণগত বিকৃতিজাত হিসেবে এর ব্যবহার।

বিশুদ্ধ শব্দের অঙ্গীভূত হয়ে 'রেফ' চিহ্নের ব্যবহারের উদ্ধৃতি এবং আলোচনা বলা বাহুল্য এখানে অনাবশ্যক। সুতরাং আমরা বিকৃতিজাত ব্যবহার নিয়েই এখানে আলোচনা করব।

শব্দের প্রথম ব্যঞ্জন বর্ণটিতে 'ঋ'-কার থাকলে অনেক সময়ে উচ্চারণ বিকৃতিতে আদি ব্যঞ্জনের 'ঋ'-কার, পরবর্তী বর্ণের উপরে 'রেফ' আকারে যুক্ত হয়ে শব্দের বিকৃতি ঘটায়। বাংলা পুঁথিতে এর উদাহরণ সর্বত্র। যেমন—নৃপ > নির্প, বৃক্ষ > বির্ক্ষ, কৃপণ > কির্পণ বা কির্পণ্য, কৃত্তিবাস > কির্ত্তিবাস, নৃত্য > নির্ত বা নির্ত্য, মৃত্যু > মির্ত্যু, বৃত্তান্ত > বির্ত্তান্ত, মৃত্তিকা > মির্তিকা, হৃদয় > হির্দয়, নৃত্যানন্দ > নির্ত্যানন্দ ইত্যাদি ক্ষেত্রে 'ঋ', 'ইর' হয়েছে। কীভাবে পুঁথিতে এই শব্দগুলি বিকৃতভাবে ব্যবহৃত হয়েছে দেখা যাক।

১. নৃপ > নির্প : চেতন করাআ তারে **নির্প** যান ঘরে।
২. বৃক্ষ > বির্ক্ষ : তার মূল **বির্ক্ষ** আছে যমুনার ঘাটে।
৩. কৃপণ > কির্পণ্য : দান শক্তি নাহি সদা **কির্পণ্য** হৃদয়।
৪. কৃত্তিবাস > কির্ত্তিবাস : **কির্তিবাস** পণ্ডিতে জিউক যুগে যুগে।
৫. নৃত্যের > নির্তের : **নির্তের** নির্নয় কথা কহিব বিদিত।
৬. মৃত্যু > মির্ত্যু : **মির্ত্যু** অঙ্গে তুল্যা দিল জান্নবির পানি।
৭. বৃত্তান্ত > বির্ত্তান্ত : আপনার **বির্ত্তান্ত** সব ব্রহ্মারে কহিল।
৮. মৃত্তিকা > মির্তিকা : গঙ্গা **মির্তিকায়** অঙ্গ করিল ভূষিত।
৯. নৃত্যানন্দ > নির্ত্যানন্দ : জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় **নির্ত্যানন্দ**।
১০. হৃদয় > হির্দয় : কোন রূপে **হির্দয়ে** থাক শুন মহাশয়।

বলা বাহুল্য এই সব উদ্ধৃতির 'রেফ' চিহ্ন এক ধরনের উচ্চারণ বিকৃতিরই চিহ্ন বা ফলস্বরূপ। এবং এক্ষেত্রে শব্দের আদি ব্যঞ্জনে স্থিত 'ঋ'-কারের বিকৃতিতে পরবর্তী বর্ণের বা যুক্তবর্ণের উপরে 'রেফ' চিহ্নের এই ব্যবহারের বিজ্ঞান-সম্মত কারণ, তথা বিশ্লেষণ পাওয়া কঠিন নয়।

আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে শব্দের আদি ব্যঞ্জনের 'ঋ'-কার বা 'র' ফলার প্রভাবে পরবর্তী ব্যঞ্জনের বা যুক্ত ব্যঞ্জনের উপরে অতিরিক্ত একটি 'রেফ'-চিহ্নের ব্যবহার লক্ষ করা যায় সংশ্লিষ্ট অনেক পুঁথিতেই। লক্ষ করবার বিষয়, এক্ষেত্রে 'ঋ'-কারের বা 'র'-ফলার অবলোপ না ঘটেই অতিরিক্ত একটি 'রেফ'-এর আবির্ভাব ঘটেছে। এই 'রেফ'-চিহ্নও এক প্রকার উচ্চারণ বিকৃতিরই নিদর্শন। 'ঋ' ও 'র'-ফলার ব্যবহারে যে এক ধরনের গাম্ভীর্যের দ্যোতনা ও ব্যঞ্জনা কর্ণগোচর হয়, এক্ষেত্রে সেই ধ্বনি গাম্ভীর্য উচ্চারণের সময়ে বিকৃতভাবে উচ্চারিত হচ্ছে বলেই লিপিতেও তা এইভাবে স্থান লাভ করেছে। যেমন—দ্রব্য > দ্রর্ব্য, ব্রহ্মা > ব্রর্হ্মা, বৃক্ষ > বৃর্ক্ষ, বৃদ্ধ > বৃর্দ্ধ, ব্রাহ্মণ > ব্রার্হ্মণ, নৃত্যানন্দ > নৃর্ত্যানন্দ, মৃত্তিকা > মির্ত্তিকা, নৃত্য > নৃর্ত্য, ইত্যাদি।

এবারে কী ভাবে পুঁথিতে এই শব্দগুলির বিকৃত ব্যবহার ঘটেছে দেখা যাক।

১. দ্রব্য > দ্রর্ব্য : ব্যয় নাহি হয় দ্রর্ব্য নাহি পরিবার।
২. ব্রহ্মা > ব্রর্হ্মা : আপনার বির্ত্তান্ত সব ব্রর্হ্মারে কহিল।
৩. বৃক্ষ > বৃর্ক্ষ : সেই বৃর্ক্ষে পঞ্চ মাসা শুন বিবরণ।
৪. বৃদ্ধ > বৃর্দ্ধ : আমি বৃর্দ্ধ অল্পমতি কি জানি তোমার স্তুতি।
৫. ব্রাহ্মণ > ব্রার্হ্মণ : ব্রার্হ্মণ ছাড়িলা বেদ য়াপন ক্রিয়া কর্ম।
৬. নৃত্যানন্দ > নৃর্ত্যানন্দ : জয় জয় নৃর্ত্যানন্দ অবধৌত মোর।
৭. মৃত্তিকা > মৃর্ত্তিকা : গঙ্গা মৃর্ত্তিকা দিয়া শ্রীঅঙ্গ মার্জন।
৮. নৃত্য > নৃর্ত্য : রার্ত্তি যোগে নৃর্ত্য গীত করিল সকলে।

এখানে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে প্রথম ব্যঞ্জন বর্ণের 'ঋ'-কার বা 'র' ফলার অবলোপ না ঘটেও 'রেফ'-এর আবির্ভাব ঘটেছে। এর ধ্বনিতাত্ত্বিক দিকটি বিশ্লেষণ করে পুঁথি বিশেষজ্ঞ মুহম্মদ আবদুল হাই বলেছেন, 'পৃথক ভাবে উচ্চারণ করলে বৈজ্ঞানিক বিচারগত দিক থেকে ধ্বনিটি যে সংজ্ঞা লাভ করে স্ব-মহিমায় পরিস্ফুট হয়ে ওঠে, অক্ষর, শব্দ বা বাক্যে ব্যবহৃত হলে তার বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক রূপে তা পরিচিত হওয়া সত্ত্বেও তার পুর্ববর্তী ও পরবর্তী ধ্বনির কিছু না কিছু গুণ তাতে সংক্রমিত হয়।'

আলোচ্য 'রেফ' চিহ্নগুলির ব্যবহারের ক্ষেত্রে একটি বিজ্ঞানসম্মত কারণ খুঁজে পাওয়া গেলেও, বাংলা পুঁথির পাতায় পাতায় আমরা এমন বহু 'রেফ' চিহ্নের ব্যবহার লক্ষ করি, 'রেফ' চিহ্নগুলি সেখানে এমন যত্রতত্র এবং যদৃচ্ছভাবে ব্যবহৃত হয়েছে, যাকে কোনোভাবেই 'র' নির্দেশক চিহ্ন হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না। এখানে দু-একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

১. কুরুর্ক্ষেত্র উপর্নিত ভির্ম্ম বির্দ্যমানে।
২. আতির্থ্য বেভারে দির্ব্বাসন জোগাইল।
৩. রাজ বস্ত্র কাকেহ দিল কনক পর্দ্ধ মালা।
৪. সর্ন্নাসি দেখিয়া প্রেমে ঝরএ নয়ান।

এখানে প্রথম উদ্ধৃতির চারটি শব্দের কোনোটিতেই 'ঋ' বা 'র'-এর স্থানে 'রেফ' চিহ্নের আগমন ঘটেনি। এমনকি 'কুরুক্ষেত্র', 'উপনীত' ইত্যাদি শব্দের ক্ষেত্রে 'ঋ' বা 'র' ফলার ব্যবহার-জাত ধ্বনি গাম্ভীর্যের প্রশ্নটিও অবান্তর। এরকম উদাহরণ আরও মেলে। যেমন—

১. কাকে হার্থি ঘোড়া দিল কাকেহ দিল দলা।
২. আর্গুয়ান ওরূদ্ধতি বিসিস্টের ব্রহ্মনি।
৩. কি কাজ সে র্ছার প্রান যেন পশু পাখি।

৪. আমি তুর্চ্ছ হিন অতি কি জানি তোমার স্তুতি।

৫. না খায় উর্ত্তম দ্রব্য তথাপি সে জন।

৬. আমা সভা লর্ল্লাটে লর্ল্লাটে প্রাতে দিব।

৭. এই মত হেতু জিবের নরকে হর্ল্য বাস।

৮. দূত বলে যুন রাজা মির্থা ক্রোধ কর।

এখানে প্রথম উদ্ধৃতির 'হার্থি' দ্বিতীয় উদ্ধৃতির 'আর্গুয়ান' এবং তৃতীয় উদ্ধৃতির 'র্ছার' যথাক্রমে 'হাতী' 'আগুয়ান' ও 'ছার'-এর বিকৃত উচ্চারণ জাত রূপ বলেই স্বাভাবিক বিচার বুদ্ধি অনুসারে ধরে নেওয়া যায়। সুতরাং পূর্বোক্ত শব্দগুলির 'রেফ' চিহ্নকে 'র'-জ্ঞাপক ধরে নিলে অর্থ বোধগত দিক থেকে বিকৃতি দেখা দেবে। ঠিক একই রকম ভাবে তুর্চ্ছ > তুচ্ছ, উর্ত্তম > উত্তম, লর্ল্লাট > ললাট, হর্ল্য > হল, মির্থা > মিথ্যা ইত্যাদি প্রত্যেক ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে 'রেফ' চিহ্নটি 'র'-জ্ঞাপক রূপে গ্রহণযোগ্য নয়।

বিভিন্ন পুঁথির পাতা ঘেঁটে এরকম উদাহরণ আরও অনেক দেওয়া যেতে পারে। যেগুলির মাধ্যমে এই ধারণা স্পষ্ট হবে যে, বাংলা পুঁথির পাতায় এমন বহু শব্দে 'রেফ' চিহ্নের ব্যবহার রয়েছে, যা 'র' নির্দেশক হিসেবে কোথাও ব্যবহৃত হয়নি।

'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' গ্রন্থের ভূমিকায় সম্পাদক শ্রীখগেন্দ্র নাথ মিত্র এই ধরনের 'রেফ' চিহ্ন সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে একস্থানে বলেছেন 'কতকগুলি শব্দকে অযথা রেফাক্রান্ত করিয়া তাহার ভিতরে একটা পাণ্ডিত্য প্রকাশের চেষ্টা মধ্য বাংলার একটা বৈশিষ্ট্য। শ্রীকৃষ্ণ বিজয়েও এই রীতিটি খুব প্রচলিত। যথা—জর্ম্ম, সর্জ্জা, রার্য্য, মূর্ত্ত, যুর্দ্ধ, চির্ত্ত, মিষ্টার্ন্ন, লর্জ্জা, কর্জ্জল ইত্যাদি।'

কিন্তু আমাদের মতে এই 'রেফ' চিহ্নগুলি যেমন 'অযথা' নয়, তেমনি আবার শুধুমাত্র 'পাণ্ডিত্য প্রকাশের চেষ্টা'ও নয়। অর্থাৎ এই সব 'রেফ' চিহ্নকে কেবলমাত্র বিকৃত উচ্চারণের ফসল হিসেবে উল্লেখ করেই বক্তব্য শেষ করা যাবে না। কারণ প্রথমত, এক উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বাংলা পুঁথিতে এই ধরনের 'রেফ' চিহ্নের ব্যবহার রয়েছে। দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন ধরনের পুঁথিতে প্রাপ্ত একই ধরনের শব্দে, একই ভাবে 'রেফ' চিহ্নের প্রয়োগ দেখে এর অন্তর্নিহিত কার্যকারণ সম্পর্কে কৌতূহল স্বাভাবিক এবং সবথেকে বড়ো কথা, পুঁথির পাতায় এইভাবে 'রেফ' চিহ্নগুলি ব্যবহৃত হবার ফলে সংশ্লিষ্ট পুঁথিগুলি পাঠ করতে গিয়ে অনেক সময়েই আমাদের Documental Probability-র সম্মুখীন হতে হয়। অর্থাৎ উচ্চারণে সাদৃশ্যবশত বর্ণের উৎপত্তি নির্ণয়ে দ্বিধা বা ভ্রম দেখা দিতে পারে। দু-একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি স্পষ্ট করা যেতে পারে। যেমন—

১. নির্ত্য গিত বাদ্য বাজে প্রভু বিদ্যমানে।

২. নিজ মদে মর্ত্ত লোক তোমা পাসরিয়া।

৩. গঙ্গা হো বাঞ্ছেন হরিদাসের মর্জন।

৪. নৃপতি পাইলে ছিদ্র করিবে নির্দ্ধন।

এখানে প্রথম উদ্ধৃতির 'নির্ত্য' শব্দটির প্রকৃত রূপ হবে 'নিত্য'। যার অর্থ রোজ, প্রতিদিন। যদি আমরা 'রেফ' চিহ্নটিকে 'র' নির্দেশক ধরে নিয়ে 'নৃত্য' করি তবে শব্দটির প্রকৃত পাঠ গ্রহণে বাধা সৃষ্টি হবে। আবার দ্বিতীয় উদাহরণের 'মর্ত্ত' শব্দটির প্রকৃত রূপ হবে 'মত্ত'—যার অর্থ হবে বিভোল, ব্যস্ত ইত্যাদি। যদি এক্ষেত্রে 'রেফ' চিহ্নটিকে 'র' নির্দেশক ধরে 'মর্ত' অর্থাৎ পৃথিবী ধরা হয় তবেও পাঠ বিকৃতির সম্ভাবনা রয়েছে। তৃতীয় উদাহরণের 'মর্জন' শব্দের প্রকৃত রূপ হবে মজ্জন তথা, নিমজ্জন অর্থাৎ অবগাহন। এক্ষেত্রেও 'রেফ' চিহ্নটিকে 'র' নির্দেশক ধরে 'মর্জন' করলে অর্থ নিরূপিত হবে না। এবং ভ্রমের সৃষ্ট হবে তথা পাঠ বিকৃতি ঘটবে। চতুর্থ উদাহরণের 'নির্দ্ধন' শব্দটি 'নিধন' শব্দেরই বিকৃত রূপ, যার অর্থ প্রাণনাশ। কিন্তু 'নির্ধন' অর্থাৎ 'ধনহীন' হবার সম্ভাবনা থেকে যায় যদি 'রেফ' চিহ্নটিকে 'র' নির্দেশক ধরা হয়। বলা বাহুল্য সেক্ষেত্রে শব্দটির প্রকৃত রূপ বা পাঠ উদ্ধার থেকে আমরা যে অনেক দূরে সরে যাব, তা বলাই বাহুল্য। আর বিশুদ্ধ পাঠ নির্ধারণ করাই সম্পাদকের প্রধান কাজ, তাকে দূরে সরিয়ে দেওয়া নয়। সুতরাং এই কারণেই এই ধরনের 'রেফ' চিহ্নের কার্যকারণ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা আমাদের থাকা একান্ত প্রয়োজন। কারণ বিভিন্ন পুঁথি পাঠে এরকম ধারণা করা খুবই স্বাভাবিক যে পুঁথির বানানের এই অনাবশ্যক 'রেফ' গুলি আপাত খাপছাড়া মনে হলেও এগুলি উপেক্ষণীয় নয়। কারণ এক্ষেত্রে অসংগতি এমন নয়, যা কোনো নির্দিষ্ট নিয়মে ধরা পরে না। সুতরাং প্রথমে আমাদের এই অনাবশ্যক 'রেফ' চিহ্ন-র চরিত্রটি নির্ধারণ করতে হবে এবং সেই সঙ্গে এর ব্যবহারের একটি যুক্তিগ্রাহ্য কারণও অনুসন্ধান করতে হবে।

এই 'রেফ' চিহ্ন ব্যবহারের পিছনে কয়েকটি কারণ অনুমান করা যায়।

প্রথমত, এই 'রেফ' চিহ্নগুলি এক ধরনের 'ক্যালিগ্রাফি'। এই 'ক্যালিগ্রাফি' শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে 'সুন্দর হস্তলিপি'। পুঁথির পাতার প্রথমে, শেষে এবং মাঝে মাঝে চিত্র অঙ্কন করে যেমন পুঁথির শোভা বর্ধন করা হত, তেমনি এমন অনেক পুঁথি পাওয়া যায়, যার পাতায় পাতায় নানা ধরনের ছোটো ছোটো ফুল, কল্কা, পাখি ইত্যাদিই শুধু আঁকা নেই, প্রতিটি শব্দের অন্তর্গত 'আ' কার 'ই'-কার 'উ'-কারের টানের শেষে একটি করে পাতা, ফুল, পাখি দিয়ে অলংকরণ করা হয়েছে। এছাড়া হস্তলিপির মধ্যেও

লিপিকরের শিল্পীসত্তা সক্রিয় হয়ে নানা ধরনের সৌন্দর্য তথা বৈচিত্র্য সম্পাদনে সচেষ্ট থাকে। এইদিক দিয়ে বিচার করে 'রেফ' চিহ্নের এই রকম বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রয়োগকে একধরনের ক্যালিগ্রাফি বলে মনে করা যেতে পারে।

দ্বিতীয়ত, আলোচ্য পুঁথির লিপিতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই যুক্ত বর্ণের মাথাতেই এই রেফ চিহ্নের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। সেই দিক দিয়ে বিচার করে এই সব 'রেফ'কে যুক্ত বর্ণ নির্দেশক হিসেবেও মনে করা যেতে পারে।

তৃতীয়ত, প্রাচীনকালে পুঁথির লিপিকাররা অধিকাংশ সময়েই শ্রুতিলিপি লিখতেন। বিশেষ করে কবির স্বহস্ত লিখিত পাণ্ডুলিপির একান্ত অভাব আমাদের এই কথাই মনে করিয়ে দেয়। সুতরাং শ্রুতিলিপি লিখতে গিয়ে হয়তো উচ্চারণের প্রস্বরগত ধ্বনি-সংঘাতকে লিপিকর উপেক্ষা করতে না পেরে, এই ধরনের আপাত অনাবশ্যক 'রেফ' চিহ্নের ব্যবহারের মাধ্যমে তাঁদের সেই অনুভূতিরই রূপায়ণ ঘটিয়েছে পুঁথির পাতায় পাতায়। সুতরাং এই 'রেফ' চিহ্ন এক হিসেবে প্রস্বর বা Accent চিহ্নের নির্দেশক হিসেবেও ব্যবহৃত হয়েছিল বলে মনে করা যায়।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা মনে রাখা দরকার। সেটি হল, বিভিন্ন পুঁথি সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, একই ব্যঞ্জন কিংবা যুক্ত বর্ণ একই পুঁথিতে, একই পরিপ্রেক্ষিতে, কোথাও 'রেফ'-এর ব্যবহার রয়েছে, কোথাও-বা নেই। সুতরাং এই সব দিক চিন্তা করে একে ক্যালিগ্রাফি বা 'হস্তিলিপিবিদ্যার' একটি বৈশিষ্ট্য বলেই ধরে নিতে ইচ্ছে করে। এটাও কতখানি যুক্তিযুক্ত পরে আমরা সে সম্পর্কেও আলোচনা করব।

সুতরাং এখানে প্রথমে আমরা পুঁথিতে এই 'রেফ'-এর অনিয়মিত ও অসংগতিপূর্ণ ব্যবহারকে সুশৃঙ্খলিত ও সূত্রবদ্ধ করে দেখাবার চেষ্টা করব। এবং পরে তারই আলোকে এর উৎসমূল সন্ধান তথা স্বরূপ লক্ষণ নির্ণয়ের চেষ্টা করব।

১.দ্বিত্বপ্রাপ্ত ব্যঞ্জনে 'রেফ'-এর ব্যবহার—

(ক) স্পৃষ্ট ব্যঞ্জন ধ্বনির দ্বিত্ব—

প্রাচীন পুঁথিতে রেফ-এর ব্যবহারের বাহুল্য লক্ষ করা যায় এই দ্বিত্ব প্রাপ্ত ব্যঞ্জন বা double consonant-এর ক্ষেত্রে।

ক্‌ক ঃ কনক নির্মিত আসন মানির্ক্য মণ্ডিত।

ক্‌খ ঃ চৌর্দ্দ সহস্র রার্ক্ষস করে হায় হায়।

ক্‌খ ঃ সেই বৃর্ক্ষে পঞ্চমাসা শুন বিবরণ।

ক্‌খ ঃ কৃ অর্ক্ষরে উৎপর্ত্তি হয় মূল ডালে।

চ্চ ঃ উর্দ্ধ **পুচ্ছ** করি নাচে গাভি বৎস গণে।

চ্চ ঃ তথাপিও হরিদাস **উচ্চৈস্বর** করি।

চ্ছ ঃ নব গুঞ্জা **শিখিপুচ্ছ** ভূষণ যাহার।

চ্ছ ঃ জে পড়িল প্রেম রসে আনে কিবা তার আযে-
বৈকুণ্ঠাদি **তুচ্ছ** করি মানে।

জ্জ ঃ দেহ তরি নৌকা করি মোন **বানির্জ্যে** জায়।

জ্জ ঃ প্রভুর কাম পুঞ্জে **উজ্জ্বল** কৈল রাধা।

জ্জ ঃ **সর্জ্জায়** সুতএ নাহি বদনে বদনে রহে।

ত্ত ঃ গুরু কৃষ্ণ না ভজে লোক না করে **উত্তম**।

ত্ত ঃ অন্তপুরে গেলা রাজা **চিত্তির** উল্লাস।

ত্ত ঃ জাহার **কবিত্ত** যুন্যা চমৎকার লাগে।

ত্ত ঃ কৃ অর্ক্ষরে **উৎপত্তি** হয় মূল ডালে।

দ্দ্ ঃ **চৌর্দ্দ** সহস্র রাক্ষস করে হায় হায়।

দ্দ্ ঃ কুরুক্ষেত্র উপর্থিত ভিস্ম **বিদ্দমানে**।

দ্ধ ঃ আজি মোর পিতৃকুল হইল **উদ্ধার**।

দ্ধ ঃ **যুদ্ধ** স্বরস্বতি বন্দো বড় **যুদ্ধ** মতি।
মহাপ্রভুর পায়ে যার **যুদ্ধ** ভকতি।

দ্ধ ঃ সতকুল সম্ভব তারা অতি **সুদ্ধাচার**।

দ্ধ ঃ কালি আমার পিতৃ **শ্রাদ্ধ** শুনহ বচন।
চণ্ডিকা বলেন **শ্রাদ্ধে** নাহি প্রয়োজন।

ব্ব ঃ আতির্থ বেভারে **দির্ব্বাসন** জোগাইল।

ব্ব ঃ অল্প দ্রব্ব লাগি কেন সবান্ধবে মর।

ব্ব ঃ বসাইল **দির্ব্বাসনে** কুসল পুছিয়া।

(খ) নাসিক্য ব্যঞ্জন ধ্বনির দ্বিত্ব—

ন্ন ঃ কুরুক্ষেত্রে **উপর্ন্নিত** ভিস্ম বির্দ্দ্যমান।

ন্ন ঃ মির্ত্তু অঙ্গে তুল্যা দিল **জান্নবির** পানি।

ন্ন ঃ আইলা **সর্ন্ন্যাসি** বড় অতি সুর্দ্ধ মতি।

ন্ন ঃ জয় জয় **শ্রীচৈতন্য** জয় নির্ত্যানন্দ।

ম্ম ঃ **ব্রাহ্মন** ছারিলা বেদ আপন ক্রিয়া কর্ম্ম।

ম্ম ঃ পুর্ব্ব **জর্ম্মার্জিত** কত পুন্নের পর্ব্বত।

ম্‌ম ঃ আপনার বির্ত্তান্ত সব ব্রহ্মারে কহিল।

ম্‌ম ঃ এন্যের্ল্লা মহার্ম্মদ সদা করে ধ্যান।

(গ) তরল ধ্বনির দ্বিত্ব ঃ—

ল্‌ল ঃ আমা সভা **লর্ল্লাটে লর্ল্লাটে** প্রাতে দিব।

ল্‌ল ঃ যাহার কবির্ত্ত ষুন্যা **উল্লসিত** লোকে।

ল্‌ল ঃ পুত্র **তুল্ল** এই শিশু নারিলু সংহারিতে।

ল্‌ল ঃ মুখে বল **আল্লার** নাম মুরসিদ ভাবিএ।

ল্‌ল ঃ এন্যের্ল্লা মহার্ম্মদ সদা করে ধ্যান।

ল্‌ল ঃ এই অষ্ট পদ্ম জবে হয় **প্রফুল্লিত**।

ল্‌ল ঃ নানা জন্ত বাদ্য বাজে **ব্যাল্লিস** বাজন।

(ঘ) শিশ ধ্বনির দ্বিত্ব—

শ্‌স ঃ পুর্ব্বেতে **ভিস্স** বৈল সব রাজার গোচরে।

শ্‌স ঃ তবে রাম কৃষ্ণ কহে **আশ্বাসিয়া** তারে।

(ঙ) অনেক সময় দেখা যায় লিপিগত দিক দিয়ে সাঙ্গীকৃত কোনো বর্ণের দ্বিত্বরূপ উচ্চারণ না হয়েও, যুক্ত বর্ণটি যদি উচ্চারণের সময় অপর কোনো ব্যঞ্জন ধ্বনির দ্বিত্বরূপ লাভ করে, তবে সেই সব ক্ষেত্রেও রেফ চিহ্নের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। যেমন—

জ + ঞ = গ্‌গ ঃ ইহার কারণ কহ **জির্জ্ঞাসি** তোমারে।

গ্‌গ ঃ শুনিয়া বির্ভল হৈয়া প্রতির্জ্ঞা করিল।

গ্‌গ ঃ জর্ন্মিলেন নিচ কুলে প্রভুর **আর্জ্ঞাতে**।

২. বিভিন্ন ফলাযুক্ত যুক্তবর্ণগুলিতে 'রেফ' চিহ্নের ব্যবহার লক্ষ করা যায় সংশ্লিষ্ট অনেক পুঁথিতেই।

(ক) প-বর্গের নাসিক্য ধ্বনির সঙ্গে সমস্থানজাত স্পৃষ্ট ব্যঞ্জনধ্বনি যখন ফলার আকারে যুক্ত হয়। যেমন ঃ—

ম + প ঃ গো বৎস **সম্পদে** তুমি রাখ যত্ন করি।

ম + ব ঃ **কদর্ম্ব** কাননে বন যমুনা নিকটে।

ম + ব ঃ মহেষ **সর্ম্বাদ** মহা প্রসাদ নিমির্ত্তে।

ম + ভ ঃ সতকুল **সর্ম্ভব** তারা অতি সুর্দ্ধাচার।

(খ) চ বা ছ — ফলার মাধ্যমে গঠিত যুক্ত বর্ণে ঃ—

শ + চ ঃ আমি **তুশ্চ** হিন অতি কি জানি তোমার স্তুতি।

শ + ছ ঃ চারি প্রহর দিন গেল আনন্দে উর্চ্ছবে।

শ + ছ ঃ জে পড়িল প্রেম রসে আনে কিবা তার আষে
বৈকুণ্ঠাদি তুর্চ্ছ করি মানে।

শ + ছ ঃ এ পদ আমার উর্ল্লসিত অন্তর।
কান্দে পুন বির্চ্ছেদের ভার।

(গ) ন-ফলাযুক্ত যুক্ত বর্ণে—

ত + ন ঃ মিষ্ট অর্ন্ন বহু বিধ বহু জর্ত্ন করি।

ত + ন ঃ বসাইল আনি তারে রর্ত্ন সিংহাসনে।

গ + ন ঃ অর্গ্নি জ্বালি বাপের করিল সংস্কার।

গ + ন ঃ এথ কহি প্রভু ভাবে মর্গ্ন হইল তথা।

প + ন ঃ স্বর্প্ন হেন না জানিহ আমার বচন।।

৩. শব্দের আদিতে অথবা মধ্যে সর্বত্র 'র' এই তরল ধ্বনি-ঘটিত যুক্ত ব্যঞ্জনের ক্ষেত্রেও 'রেফ'-এর প্রয়োগ বহু পুঁথিতেই লক্ষ করা যায়। যেমন—

ব্যয় নাহি হয় দ্রর্ব্ব নাহি পরিবার।
পার্ত্র মির্ত্র পুরস্কার পাঞা আপন ঘরে জাএ।
কোন রূপে হ্রির্দ্রে (হৃদয়ে) থাক কহ মহাশয়।
অল্প দ্রর্ব্ব লাগি কেন সবান্ধবে মর।
চল বির্প্র শীর্ঘ্র তুমি তাহার চরণে।
কালি আমার পিতৃ শ্রার্দ্ধ সুনহ বচন।

৪. বিভিন্ন স্থানজাত স্পর্শধ্বনি-সমন্বিত যুক্ত ব্যঞ্জনগুলির ক্ষেত্রেও অনেক পুঁথিতেই 'রেফ' চিহ্নের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। যেমন ঃ—

জর্ম্মজয় বলে তবে সুন মহামুনি।
পুর্ব্ব জর্ণ্মে আমার আছিল বহু ধন।
উঠিলা সংভ্রমে দেখি পার্দ্য অর্ঘ লয়া।
এত অনুসর্দ্ধান না হবে কোন জন।
পুর্ব্বে জে কহিয়াছি মোর অর্ঙ্গীকার।
অর্স্ট গন্ধ অর্স্ট পর্ত্র কহে শ্রীমুকুন্দ।
কৃপা কর দিন বর্ন্ধু অহে ভগোবান।
সুমেরু সুন্দর তনু রর্ক্ত লোচন।
হাথে খর্ড়গ লৈঞা রাজা কাটিবারে জায়।

৫. মৌলিক ব্যঞ্জনের ক্ষেত্রেও অনেক সময়েই এই 'রেফ'-চিহ্নের ব্যবহার বহু পুঁথিতেই দেখা যায়। আর সেই সব ক্ষেত্রে একটি বিষয় সুস্পষ্টভাবে লক্ষ করা যায় যে, এই পর্যায়ে 'রেফ' চিহ্নটি সংশ্লিষ্ট ব্যঞ্জনটির দ্বিত্ব নির্দেশক হিসেবেই কাজ করেছে। ফলে উদ্ভূত দ্বিত্বপ্রাপ্ত ব্যঞ্জনটি প্রায় সব সময়েই বিশুদ্ধ শব্দ সংগঠিত করতে সাহায্য করে। দ্বিত্ব নির্দেশনায় মৌলিক ব্যঞ্জনে বিশুদ্ধ শব্দ সংগঠনে 'রেফ' চিহ্নের ব্যবহারের এই রকম কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হল—

পাদ্য — উঠিলা সংভ্রমে দেবি পার্দে অর্ঘ লইয়া।
লজ্জিত — দিগ্বিজই বড় হৈল **লর্জ্জিত** অন্তরে।
সজ্জন — গঙ্গা হো বাঞ্ছেন হরিদাষের **মর্জ্জন**।
উদ্যেশে — **উর্দ্দেশে** না জানেন কেহ কি বা সংকির্ত্তন।
নৃত্যানন্দ — জয় জয় **নৃর্ত্তানন্দ** অবধৌত মোর।
নবদ্বিপ — জয় জয় **নবর্দ্দিপ** জন্ম দিপ সার।
চৈতন্য, নৃত্যানন্দ — জয় জয় **শ্রীচৈতর্ন্য** জয় **নির্তানন্দ**।
হরিধ্বনি — **হরির্ধনি** সুনিলে সকল পাসরি।
আতিথ্য — **আতির্থ** বেভারে দির্ব্বা সন জোগাইল।
নৃত্যের — **নির্তের নির্ন্নয়** কথা কহিব বিদিত।
মধ্য — পুত্র বোধে আগে পাছে **মর্ধখানে** বুড়া নাচে।
পদ্ম — রাজ বস্ত্র কাকেহ দিল কনক পর্দ মালা।
অশ্বত্থামা — চিন্তিয়া বোলিল **অস্মর্থামা** মহামতি।
মহাজ্বর — গদ গদ ইন্দ্রিয় দেহ ভেল **মহার্জ্জর**।
মিথ্যা — দুত বলে যুন রাজা **মির্থা** ক্রোধ কর।
তুচ্ছ — আমি **তুর্চ্ছ** হিন অতি কি জানি তোমার স্তুতি।
উত্তম — না খায় **উর্ত্তম** দ্রব্য তথাপি সে জন।
জন্ম — পাপের কারনে **জর্ম** হইল সৃগাল।
কবিত্ব — যাহার **কবির্ত্ব** যুন্যা লাগে চমৎকার।
চিত্তের — অন্তপুরে গেলা রাজা **চির্ত্তির** উল্লাস।
বিদ্যামদে — **বির্দ্যামদে** ভ্রমিতক বিচার করিয়া।
বিহ্বল — শুনিঞা **বির্ভোল** হৈয়া প্রতিজ্ঞা করিল।

এখানে এই 'বির্ভোল' শব্দটি সম্পর্কে একটু আলোচনার প্রয়োজন। এখানে দেখা যাচ্ছে 'বির্ভোল শব্দস্থিত 'রেফ' চিহ্নটি দ্বিত্ব নির্দেশক হিসেবে গ্রহণ করলে তবেই

বিশুদ্ধ শব্দ সংগঠন সম্ভব হচ্ছে। অথচ এই বির্ভোল শব্দটিকে আপাতদৃষ্টিতে অশুদ্ধ শব্দ বলে মনে হলেও এটি সংস্কৃত 'বিহ্বল' শব্দেরই অপ্রচলিত চলিত রূপ। এই শব্দটির উৎস বোঝাবার জন্য আমরা বঙ্গীয় শব্দকোষ থেকে 'বিহ্বল' শব্দের অর্থ নির্দেশক অংশটুকু এখানে উদ্ধৃত করলাম। "[সং-বি + √হ্ব ল্ + অ (অচ) - ক] - বিভ্বোল, বিভোল; অপ্র।' পৃ. ১৫৯২। আবার "সং-বিহ্বল > প্রা বিব্ভল (হে) > বা, ল, লা।" পৃ. ১৫৫৮ দ্রষ্টব্য।

বাংলা পুঁথিতে ব্যবহৃত এই সব আপাত অনাবশ্যক 'রেফ' চিহ্নের ব্যবহার সম্পর্কিত এতক্ষণ যে সব উদাহরণ সংগ্রহ ও সঙ্কলন করা হল, মোটামুটিভাবে তাদের একটি নির্দিষ্ট নিয়মের মধ্যে আবদ্ধ করে শ্রেণিগত বিভাজনের চেষ্টা করতে গিয়ে দেখা গেল, এগুলি মোটেই নিয়মশৃঙ্খলা বহির্ভূত খামখেয়ালিভাবে ব্যবহৃত নিতান্ত অনাবশ্যক নয়। তাই একদিকে যেমন এই 'রেফ' চিহ্নকে 'ক্যালিগ্রাফি'র অন্তর্ভুক্ত করেই ক্ষান্ত হওয়া যাবে না। অন্যদিকে তেমনি দেখা যাচ্ছে যে এই 'রেফ' চিহ্নগুলি বিচ্ছিন্ন ও ব্যতিক্রম বিশেষে সীমিত কয়েকটি ক্ষেত্রে ছাড়া অধিকাংশ স্থলেই যুক্ত ব্যঞ্জনের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়েছে। আবার মৌলিক ব্যঞ্জনের ক্ষেত্রেও এই 'রেফ' চিহ্নগুলি দ্বিত্ব নির্দেশক হিসেবেই কাজ করেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও কেবলমাত্র যুক্ত বর্ণ নির্দেশের উদ্দেশেই আলোচ্য 'রেফ' চিহ্নের ব্যবহার সীমাবদ্ধ ছিল না। এর পিছনে অপর একটি কারণও ছিল, যার ভূমিকাও নিতান্ত নগণ্য নয়। সেটি হল প্রস্বর বা Accent নির্দেশ। পুঁথির পাতায় অনেক সময়েই দেখা গেছে, একই পুঁথিতে একই যুক্ত বর্ণে কোথাও 'রেফ' চিহ্নের ব্যবহার করা হয়েছে, আবার কোথাও কোথাও তা অনুপস্থিত। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে এগুলি হয়তো লিপিকরের প্রমাদ বা অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি। কিংবা নিতান্তই খামখেয়ালিপনার নিদর্শন বিশেষ। প্রাথমিকভাবে তাই মনে হবে বটে। কিন্তু একটু গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে, বিশেষভাবে ছন্দের মাত্রা গণনা করে দেখলে উপলব্ধি করা যাবে যে, সংশ্লিষ্ট যুক্তবর্ণগুলিকে বিশ্লিষ্টভাবে পাঠ করে মাত্রার সমতা রক্ষা করা হয়েছে। আর এই কারণেই যুক্তবর্ণগুলিতে প্রস্বর বা Stress তথাAccent রক্ষা করা যায়নি। সুতরাং সেই সব যুক্ত বর্ণের ক্ষেত্রে 'রেফ' চিহ্নও ব্যবহৃত হয়নি বা ব্যবহারের প্রয়োজন দেখা দেয়নি।

কিন্তু তাই বলে আলোচ্য 'রেফ' চিহ্নগুলি সর্বত্রই প্রস্বর নির্দেশক, এমন সিদ্ধান্ত করলেও ভুল হবে। তবে এমন অনেক মৌলিক ব্যঞ্জনে 'রেফ' চিহ্নের ব্যবহার লক্ষ করা যায়, যাকে দ্বিত্ব নির্দেশক হিসেবে গ্রহণ করলে বিশুদ্ধ শব্দ সংগঠিত হবে না। আবার এদের শব্দের আদি ব্যঞ্জনস্থিত 'ঋ' বা 'র'-কারের চিহ্ন হিসেবে গ্রহণ করলে

ভুল হবে। সেই সঙ্গে দ্বিত্ব নির্দেশক হিসেবে গ্রহণ করলেও ভুল হবে। এই সব ক্ষেত্রে দেখা যায় এই 'রেফ' চিহ্ন প্রস্বর বা Accent-এর নির্দেশক। দু-একটি উদাহরণ দেওয়া যাক।

১. কুরুর্ক্ষেত্র উপর্ন্নিত ভির্ম্ম বির্দ্য মানে।
২. আর্তিথ বেভারে দির্ব্বাসন জোগাইল।
৩. আর্গুয়ান ওরুন্ধতি বিসিষ্টের ব্রর্ম্মনি।

এখানে 'ক্ষ', 'ন্ন', 'ম্ম', 'র্থ', 'ব্ব', 'ন্ধ', 'ম্ম'—ইত্যাদি যুক্ত বর্ণগুলি বর্ণভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করলে দ্বি-মাত্রিক। কিন্তু শ্রুতির বিচারে দেখা যায় এরা একমাত্রিক এবং এক মাত্রা ধরে হিসেব করলে কবিতার চরণগুলিতে এরা সমতা রক্ষা করে। সুতরাং এক্ষেত্রে বুঝতে হবে, এগুলি সংশ্লিষ্ট ভঙ্গিতে একমাত্রিক ধ্বনি হিসেবেই উচ্চারিত হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, উদ্ধৃতির প্রতিটি চরণই চোদ্দো অক্ষর সমন্বিত পয়ার ছন্দের অন্তর্ভুক্ত। হরফ গণনা করে নয়, বরঞ্চ শ্রুতিবিচারে, কান-ই এখানে ধ্বনি বিশ্লেষণের সবচেয়ে নির্ভযোগ্য অবলম্বন।

সুতরাং এই সব ক্ষেত্রেও 'রেফ' চিহ্নগুলিকে 'ক্যালিগ্রাফি' বলে মনে করবার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। এই ধরনের উদাহরণ আরও দু-একটি দেওয়া হল :

১. আমার্দের কুলঙ্গার করিল কু জস।
২. কি কাজ সে র্ছার প্রাণ জেন পষু পাখি।
৩. কাকে হার্থি ঘড়া দিল কাকেহ দিল দলা।

এখানে আমার্দের (আমাদের), র্ছার (ছার), আর্গুয়ান (আগুয়ান), হার্থি (হাতি), ইত্যাদি শব্দস্থিত 'রেফ'-চিহ্নগুলি দ্বিত্ব নির্দেশক ধরলে বিশুদ্ধ শব্দ সংগঠন সম্ভব নয়। এগুলি সম্পূর্ণভাবেই প্রস্বর বা Accent নির্দেশক। সুতরাং একে 'ক্যালিগ্রাফি' বলবার কোনো যুক্তিগ্রাহ্য কারণ নেই।

আবার প্রস্বরের বিপুল ক্রিয়ার কথা মনে রেখেও শব্দস্থিত এই সব 'রেফ' চিহ্নকে শুধুমাত্র প্রস্বর চিহ্ন নির্দেশক যেমন বলা যায় না, তেমনি শুধুমাত্র যুক্তবর্ণ নির্দেশকও বলা যায় না। কারণ, যুক্তবর্ণ নির্দেশের সীমিত ক্ষেত্রের আলোচনা ইতিপূর্বেই করা হয়েছে। আবার মৌলিক ব্যঞ্জনে 'রেফ' চিহ্ন ব্যবহারের দ্বারা দ্বিত্ব নির্দেশ, যেমন ভার্গ (ভাগ্য), ইত্যাদি ক্ষেত্রের আলোচনাও করা হয়েছে। সীমিত কয়েকটি ক্ষেত্রে দেখা যায়, আঞ্চলিক উচ্চারণ বৈশিষ্ট্যের কারণে অনেক সময় মৌলিক ব্যঞ্জনধ্বনি দ্বিত্ব রূপে নির্দেশিত হয়েছে। যেমন, 'অধিক' বা 'সকল' শব্দ দুটি ধরা যেতে পারে। সংশ্লিষ্ট কোনো কোনো পুঁথিতে এদের বানান পাওয়া যায় দু-ভাবে। 'সর্ক্কল' বা 'সর্কল' এবং

'অধিক্ষ' বা 'অধির্ক'। এখানে আঞ্চলিক উচ্চারণ বৈশিষ্ট্যে 'ক' ধ্বনির আঞ্চলিক মহাপ্রাণ উচ্চারণের ক্রিয়া-জনিত কারণেই দুটি ভিন্ন বানান পাওয়া যাচ্ছে। এই সব ক্ষেত্রে ব্যবহৃত 'রেফ' চিহ্ন এক হিসেবে আঞ্চলিক উচ্চারণে প্রস্বর জনিত 'খ'-এর ব্যঞ্জনা ক্রিয়া করলেও, সেই সঙ্গে লিপিগত দিক থেকে এক্ষেত্রে এগুলি দ্বিত্ব রূপেই লিখিত হয়েছে।

সুতরাং শব্দে ব্যবহৃত আপাত অ-নাবশ্যক 'রেফ'-চিহ্নকে দ্বিত্ব নির্দেশক হিসেবে ধরে নিলেও এগুলির ব্যবহারের পিছনে প্রস্বর নির্দেশের বিপুল ক্রিয়ার কথাও একই সঙ্গে মনে রাখতে হবে। অর্থাৎ এক কথায় বলা যায়, বাংলা পুঁথির লিপিতে ব্যবহৃত 'রেফ' চিহ্নগুলি সর্বত্র যুক্তবর্ণ নির্দেশে ব্যবহৃত হলেও প্রস্বর বা Accent নির্দেশও এর অন্যতম প্রধান কারণ।

(৪)

পুঁথির পাতায় সাঁটলিপি

ছাপাখানা আবিষ্কারের আগে, পুঁথি-লেখক বা লিপিকরেরা লেখার সুবিধা এবং লেখার শ্রম ও সময় বাঁচাবার জন্য, লেখার মধ্যে বিশেষ করে যুক্তাক্ষরের ক্ষেত্রে একধরনের দ্রুত লিখন-পদ্ধতিমূলক সাংকেতিক চিহ্ন বা সাঁটলিপি প্রবর্তন করতে থাকেন। এই সাঁটলিপিকে কিন্তু ধ্বনিলিপি বলা যায় না, কারণ তা ভাষার ধ্বনি-এককে (phoneme) রূপায়িত করে না। কাজ-চালানো গোছের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে মাত্র। দ্রুত লেখার প্রয়োজনে একাধিক বর্ণ, কখনো-বা গোটা বাক্য বা বাক্যাংশেরই হ্রস্ব-সংকেত প্রকাশ করে দ্রুত লিখন-পদ্ধতি (Shorthand writing)। স্থানবিশেষে তার একটা বিশেষ উপযোগিতা রয়েছে; কিন্তু তা বর্ণমালায় স্থান পাবার যোগ্য নয়। কিন্তু বাংলা লিপিতে আমরা যখন অস্বচ্ছ যুক্তাক্ষর অর্থাৎ ক্ এবং ত্-এর যুগ্মরূপ হিসেবে 'ক্ত' লিখি বা, ন্ এবং ত-এ হ্রস্ব উ-এর যুগ্মরূপ হিসেবে 'ন্তু' লিখি, তখন কিছুটা এই সাঁটলিপির পদ্ধতিই অনুসরণ করে থাকি। বাংলা লিপিতে এই ধরনের যুক্তাক্ষর অনেক রয়েছে। যেমন, ক্ + র = ক্র, ঙ্ + গ = ঙ্গ, ঙ্ + ক = ঙ্ক, ঞ + চ = ঞ্চ, ঞ্ + ছ = ঞ্ছ, ঞ্ + জ = ঞ্জ, ঞ্ + ঝ = ঞ্ঝ, দ্ + ধ = দ্ধ, ন্ + থ = ন্থ, ষ্ + ণ = ষ্ণ, স্ + থ = স্থ, হ্ + ম = হ্ম, জ + ঞ = জ্ঞ, ট্ + ট = ট্ট, ত্ + ত = ত্ত, হ্ + ন = হ্ন, থ্ + থ = থ্থ ইত্যাদি। কিন্তু দ্রুত লিখনের প্রয়োজনে ব্যবহৃত অতিসংক্ষেপণ, লিপির ক্ষেত্রে কাম্য নয়। কারণ লিপি হবে ধ্বনির যথোপযুক্ত প্রতিরূপ—ধ্বনির অতিরিক্তও নয়, কমও নয়। এই কারণে বর্তমানে বাংলা বানান সংস্কার প্রসঙ্গে এইসব অস্বচ্ছ যুক্ত ব্যঞ্জন

চিহ্নগুলি বা সাঁটলিপির প্রতীকগুলি বর্জন করে, তার স্বচ্ছ রূপ বা বিশ্লেষিত আকারে লেখার প্রস্তাব করা হয়েছে।

বাংলা পুঁথির পাতায় এই সাঁটলিপির মতোই, কিন্তু তার থেকে আরও জটিল আকারের কতকগুলি শব্দের সম্মুখীন হতে হয়, যার অবয়বে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে যে, কৌতূহলী পাঠকের দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট না হয়ে পারে না।

এই শব্দগুলি কোনো একটি বা দুটি পুঁথিতে দেখা গেলে, তাকে নিয়ে কৌতূহল যতই গাঢ় হোক না কেন, তা বিশ্লেষণের গুরুত্ব লাভ করত না। কিন্তু সংশ্লিষ্ট পুঁথিতে এদের পুনরাবৃত্তি, সেই সঙ্গে অন্যান্য শব্দের পাশাপাশি এই শব্দগুলির বৈসাদৃশ্যমূলক অস্তিত্ব, বুনুনির মতো এর সুচিত্রিত অঙ্গসৌষ্ঠব (pattern), সংশ্লিষ্ট পাঠককে এর প্রতি আগ্রহী করে তোলে।

আলোচ্য শব্দগুলির এক-একটি, লিপিগত কিংবা আকৃতিগত বিচারে একটি মাত্র যুক্তবর্ণ হলেও, প্রকৃতিতে এরা একাধিক একাক্ষর (Mono Syllable)-এর সমন্বয়। অর্থাৎ আকৃতিতে একটিমাত্র যুক্তবর্ণ কিন্তু প্রকৃতিতে একাধিক যুক্তবর্ণসমন্বিত শব্দ। মিশ্র প্রকৃতির এই শব্দগুলির প্রত্যেকটিকে একটি করে যুক্তবর্ণ হিসেবে গ্রহণ করলে এগুলি বাংলা লিপির মূল প্রকৃতির বিরোধী হয়ে দাঁড়ায়। কারণ বাংলা লিপির মূল গঠন ধ্বনি, বর্ণ ও অক্ষরমূলক। আবার শব্দ হিসেবে ধরে নিলেও এতে অক্ষর ভাগ (Syllabification) সম্পর্কিত সমস্যা থেকে যায়। যেমন কৃষ্ণ (কৃষ্ণ) প্রভু (প্রভু) কুণ্ড (কুণ্ড) ইত্যাদি বাংলা পুঁথির পাতার বিশিষ্ট শব্দগুলিকে শুধুমাত্র শব্দ আখ্যা দিলে প্রশ্ন দেখা দেয়—এগুলি কী ধরনের শব্দ? এগুলিকে একাক্ষরিক শব্দ, সংক্ষিপ্ত শব্দ অথবা সংকুচিত শব্দ—ইত্যাদি কোন্ সংজ্ঞায় ভূষিত করলে সঠিক পরিচয় পাওয়া সম্ভব, এরকম একটি জটিল প্রশ্ন খুব স্বাভাবিকভাবেই এসে পড়ে।

প্রথমত, আকৃতিতে এই শব্দগুলি এক একটি যুক্তবর্ণ হলেও, প্রকৃতপক্ষে এগুলি কেবল একটি একাক্ষর (Monosyllable)-এর প্রতিলিপি মাত্র নয়। সুতরাং এগুলি একাক্ষর শব্দ নয়।

সংক্ষিপ্ত শব্দ বলতে যা বোঝায় অর্থাৎ একটি শব্দ, যা তার কোন না কোন অংশকে বর্জন করে গড়ে উঠেছে[২২] তা-ও নয়। কারণ আলোচ্য শব্দগুলি সংকুচিত হয়েছে ঠিকই, কিন্তু তার অবয়বে কোনো অংশবিশেষকে বর্জনের মাধ্যমে সংক্ষিপ্ত হয়নি। সুতরাং সংক্ষিপ্ত শব্দও একে বলা চলে না। অন্যদিকে এদের এক অর্থে সংকুচিত শব্দ বলা যেতে পারে। কিন্তু তাতে আলোচ্য শব্দরাজিতে সংকোচনের পরিমাণটা কী ধরনের, তা স্পষ্ট নির্দেশিত হয় না। অর্থাৎ 'সংকুচিত শব্দ'—এই সংজ্ঞার দ্বারাও

আলোচ্য শব্দের এক একটির মধ্যে একাধিক যুক্তবর্ণ যেভাবে একাঙ্গীভূত হয়ে অবস্থান করছে, এই বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে নির্দেশিত হতে পারে না।

অন্যদিকে, এই শ্রেণির শব্দগুলিকে একাক্ষরিক বা সংক্ষিপ্ত শব্দ বলা না গেলেও, একাঙ্গীভূত শব্দ বা সংক্ষেপে একীভূত শব্দ বলা যেতে পারে। অন্তত এই সংজ্ঞার মাধ্যমে শব্দগুলির অবয়বগত এবং প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য খানিকটা ধরা পড়ে। বর্তমান প্রবন্ধে এই একাঙ্গীভূত বা 'একীভূত' শব্দগুলির উদ্ভবের কারণ, প্রক্রিয়া, গঠনশৈলী, লিপিগত বৈশিষ্ট্য, স্থায়িত্ব এবং বর্তমানে অবলুপ্তির কারণ সম্পর্কে বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যেতে পারে।

উদ্ভবের কারণ : বাংলা পুঁথির পাতায় পাতায় প্রাপ্ত কতকগুলি বিশেষ শব্দের (যেমন কৃষ্ণ, কুণ্ড, প্রভু) একাঙ্গীভূতকরণ কোনো আকস্মিক ঘটনামাত্র নয়, কারণ আকস্মিক ঘটনা হলে, তা শতাব্দক্রমে বিভিন্ন পুঁথিতে যেমন পাওয়া যেত না, তেমনি কতকগুলি বিশেষ শব্দের মধ্যেই এই প্রক্রিয়া সীমাবদ্ধও থাকত না। এছাড়াও, এগুলি যদি আকস্মিক ঘটনামাত্র হত, তবে তাকে কোনোরকম কার্যকারণ সূত্রের আওতায় আনাও সম্ভব হত না। কিন্তু আমরা দেখেছি, আলোচ্য একীভবন প্রক্রিয়াটি কতকগুলি বিশেষ শব্দের ক্ষেত্রেই ঘটেছে, তার বাইরে অন্যত্র এই প্রক্রিয়া কার্যকর হয়নি। আকস্মিক ঘটনামাত্র হলে, সংশ্লিষ্ট লিপিকরেরা নির্দিষ্ট শব্দগুলি ছাড়াও আরও বহু শব্দের যে-কোনো একটিকে একীভূত করবার জন্য বিকল্প হিসেবে গ্রহণ করতে পারতেন। দ্বিতীয়ত, এই একাঙ্গীভবন ক্রিয়াটি সমস্ত ক্ষেত্রেই একটি বিশেষ প্রক্রিয়ার সাহায্যে ঘটেছে। যখন কোনো বিশেষ শব্দকে লিপিকর একীভূত করেন, তখন এই প্রক্রিয়াটি একই পুঁথিতে বহুভাবে হতে পারত, অথবা বিভিন্ন পুঁথিতে ভিন্ন ভিন্ন রকমে ঘটতে পারত। কিন্তু বাস্তবে তা ঘটেনি। সুতরাং দেখা যাক, এই একাঙ্গীভূত শব্দগুলির মধ্যে এমন কোনো বৈশিষ্ট্য রয়েছে কিনা, যা কোনো বিশেষ কারণে সংশ্লিষ্ট লিপিকরকে সম্ভাব্য অন্য সকল শব্দের মধ্য থেকে, বিশেষ কতকগুলি শব্দকে একাঙ্গীভূত করতে সাহায্য করেছিল।

বলা বাহুল্য, আলোচ্য একাঙ্গীভূত শব্দের অবয়বের বৈশিষ্ট্য, বা নতুনত্বই সংশ্লিষ্ট লিপিকরের মনোযোগ আকর্ষণের সহায়ক হয়েছিল। পুঁথির শেষের 'পুষ্পিকা' অংশে বিবৃত 'যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং'—ইত্যাদি শ্লোক জুড়ে দিয়ে আদর্শ পুঁথির হুবহু অনুকরণ-কাজের দৃষ্টান্ত অধিকাংশ লিপিকরই রেখে গেছেন। সুতরাং পুঁথি নকল করবার সময়ে তাঁরা যে (কৃষ্ণ), (কুণ্ড), (প্রভু) ইত্যাদি শব্দেরও অবিকল নকল করে গেছেন, তা অনুমানের অপেক্ষা রাখে না। আবার সংশ্লিষ্ট পুঁথিগুলিতে এদের পুনরাবৃত্তিই, এই আকর্ষণের স্বাক্ষর হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

প্রথম প্রথম এইসব একাঙ্গীভূত শব্দগুলি অনভ্যস্ত দৃষ্টিতে সংশ্লিষ্ট লিপিকরদের যে বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল, একথাও অনুমান করা যায়। সেক্ষেত্রে, এই শব্দগুলিকে কোনোরকম অমনোযোগিতা-প্রসূত আকস্মিক ঘটনা হিসেবে ধরে নিয়ে এদের গুরুত্ব লাঘব করা উচিত নয়। বরং এদের উৎপত্তি এবং যে পদ্ধতিতে এগুলির সৃষ্টি হয়েছে, সেই কার্যকারণ সূত্রের অনুসন্ধান করে দেখা যেতে পারে।

গঠনগত বৈশিষ্ট্য : মানুষের হাতে লেখা লিপি কালে কালে নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে, অনবরত রূপান্তরিত বা পরিবর্তিত হতে হতে আধুনিক স্তরে এসে পৌঁছেছে। এর মধ্যবর্তী কোনো স্তরই দীর্ঘকাল সুসম্পূর্ণ বা অপরিবর্তনীয় হয়ে থাকেনি। লিপির এই বিবর্তন-ধারার অন্যান্য অনেক কারণের মধ্যে, লেখার দ্রুততা ও হাত না তুলে লেখার স্বাভাবিক প্রবণতা অন্যতম। সব কিছুর মধ্যেই সোজা পথ খোঁজার চেষ্টা, মানুষের মজ্জাগত দুর্বলতা। আদিম কাল থেকে আজ পর্যন্ত এই পথে মানুষের প্রয়াসের অন্ত নেই। আর এইসব কারণেই বাংলা লিপিতে বর্ণের প্রাথমিক রূপ (initial form) পরবর্তীকালের লিপিতে স্থান-কাল ভেদে নানারূপ ধারণ করেছে। বাংলা পুঁথির পাতার পূর্বোক্ত (কৃষ্ণ), (প্রভু), (কুণ্ড) ইত্যাদি মৌল শব্দকাঠামোতে এই ধরনের পরিমাণগত পরিবর্তনের কারণও এটাই। অর্থাৎ আলোচ্য শব্দগুলির চরিত্র অপরিবর্তিত থাকলেও, এগুলির অভ্যন্তরে যে মৌলিক অক্ষর-উপাদান নিয়ে ঐসব শব্দগুলি গঠিত, সেসব অক্ষরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত কোনো কিছুর পরিমাণ বাড়তে বা কমতে থাকে। যেমন (কৃষ্ণ) (প্রভু) (কুণ্ড) এই একীভূত শব্দগুলির গঠনগত বৈশিষ্ট্যের দিকে দৃষ্টি দিলে আমরা দেখতে পাব তিনটি শব্দেরই প্রথম অক্ষর অর্থাৎ (কৃ) (প্র) ও (কু) অপরিবর্তিত থাকলেও পরবর্তী পর্যায়ে অর্থাৎ (ষ্ণ) (ভূ) ও (ণ্ড)-এর ক্ষেত্রে ঘটে গেছে বিপুল পরিবর্তন। আর এই পথেই সূচিত হয়েছিল একীভূত শব্দের গঠন-ইতিহাসের আদি পর্ব।

মানুষের মনের যে সহজাত সাম্যবোধ তার ভাষা-বন্ধনকে দৃঢ় করেছে, বাংলা লিপির বিবর্তন, পরিবর্তন ও বিকাশে বিশেষ সাহায্য করেছে, মানব-প্রকৃতির সেই সহজাত সাম্যবোধেই, বিবিধ ভিন্নাকার বর্ণ বা যুক্তবর্ণকে এক ছাঁচে ঢেলে সাজাবার প্রচেষ্টা, এইসব একীভূত শব্দগঠনের ক্ষেত্রেও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। প্রাথমিক রূপ থেকে অনেকখানি পরিবর্তিত ষ্ণ, ভূ ও ণ্ড প্রকৃতপক্ষে যে মানব-মনের নিগূঢ় সামঞ্জস্যবোধকে সক্রিয় হবার অনুপ্রেরণা দান করেছিল, তা বিভিন্ন পুঁথিতে

ব্যবহৃত (ত্ত) (তু), (ও) (ক্ত) ইত্যাদি বর্ণ, স্বরসংযুক্ত ব্যঞ্জন অথবা যুক্তবর্ণই সংশ্লিষ্ট লিপিকরের অবচেতন মনে প্রভাব বিস্তার করে, 'ঞ্চ', 'ভূ' ইত্যাদিকে যে একীভূত-শব্দস্থিত অবয়ব ধারণ করতে পরোক্ষ সাহায্য করেছিল, বাংলা পুঁথির পাতায় পাতায় এর উদাহরণ মেলে। সেখানে দেখা যায়, সামান্যতম সাদৃশ্য থাকলেই যে-কোনো বর্ণ, স্বর-সংযুক্ত ব্যঞ্জন অথবা যুক্তবর্ণকে অনেক লিপিকরই একাকার করে ফেলেছেন। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায় 'ঙ'-এর সাদৃশ্যে অনেক পুঁথিতেই 'উ' 'ঙ'-এর সদৃশ আকার ধারণ করেছে।[২৩] অর্থাৎ সেসব ক্ষেত্রে 'ঙ' এবং 'উ' এমনভাবে অভিন্ন যে, বাক্যাংশগত অর্থবোধ ব্যতিরেকে তাদের স্বতন্ত্র করা কঠিন। আবার চন্দ্রবিন্দুর প্রভাবের ফলে 'উ'-এর চৈতন ব্যবহারের পরিবর্তে 'ড'-এর শীর্ষদেশে চন্দ্রবিন্দুর ব্যবহারে 'উ' হরফ লেখার নিদর্শনও বহু রয়েছে।[২৪] অর্দ্ধবাহু 'জ'-এর প্রভাবজাত 'ড' হরফ লেখার নিদর্শনও দুর্লভ নয়।[২৫]

আলোচ্য অর্দ্ধবাহু 'ড' সম্পর্কে এখানে দু-চার কথা বলে নেওয়া দরকার, যা 'ড' অক্ষরকে 'ড়' এবং 'উ' অক্ষর থেকে পৃথক করতে সাহায্য করত প্রাচীনকালে। 'ড' অক্ষরটির সঙ্গে যুক্ত নির্ধারক চিহ্নটি, উক্ত অক্ষরের যে রেখাটি মাত্রা থেকে যাত্রা করে ভূমি বরাবর যাবার পথে একটু অগ্রসর হয়েই, ডানদিকে বাঁক নিয়ে যেখানে একটু মোচড় খেয়ে অর্ধ বৃত্তাকারের সৃষ্টি করে সেই রেখাটির প্রথম ঋজু অংশের মধ্যভাগে, ভূমির সমান্তরালে একটি ছোটো অনুভূমিক রেখা যুক্ত করা হয়েছে। এই চিহ্নটি প্রাচীন অর্দ্ধবাহু 'জ'-এর বাহুটির সদৃশ। এই ক্ষুদ্র নির্ধারক চিহ্নটিই 'ড' অক্ষরকে 'ড়' এবং 'উ' থেকে পৃথক করতে সাহায্য করত। এখানে বলা দরকার যে, অনেক পুঁথিতে, যেমন শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুঁথিতে, 'জ' হরফটি আলোচ্য নির্ধারক চিহ্নসমন্বিত 'ড' হরফটির সঙ্গে প্রায় অভিন্ন। যেমন, (ডাকে) ও (জি)।

আবার 'ব্ব'-এর সাদৃশ্যে কোনো কোনো প্রাচীন পুঁথির (ঝ), (ব্ব) আকৃতিবিশিষ্ট হয়ে পড়েছে এমন উদাহরণও দুর্লভ নয়।[২৬] সুতরাং বলা যায় একাঙ্গীভূত শব্দগঠন প্রক্রিয়ায় একাধিক বর্ণের মধ্যকার সাদৃশ্য, বা সাম্যবোধ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এই প্রসঙ্গে ডক্টর সুকুমার সেনের বক্তব্যটি উল্লেখ করা হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না। "........ বক্তার বা শ্রোতার মনে বাক্যবদ্ধ পদগুলির পৃথক সত্তাবোধ আছে বটে কিন্তু সেগুলি মনের ভাণ্ডারে এলোমেলো ছড়ানো থাকে না, যেন থাকে থাকে বা খোপে খোপে গোছানো থাকে। বাঙ্ময় মানুষের মনের অত্যন্ত স্বাভাবিক ধর্ম হচ্ছে পদভাণ্ডারে পদগুলিকে যেন থাকে থাকে বা খোপে খোপে গুছিয়ে রাখা। সুতরাং কোন

খোপের সব পদ এক এক করে মনে রাখতে হয় না; প্রত্যেক খোপের বা থাকের দুচারটি পদ মনে রাখলেই হয়। আবশ্যকমতো সেই পদগুলির সাদৃশ্যে অর্থাৎ ছাঁচে বা ছাপে অপর পদ ইচ্ছেমতো গড়ে নেওয়া যায়।[২৭]

একীভূত শব্দগঠনে লিপিতাত্ত্বিক ও মনস্তাত্ত্বিক দিক দিয়ে বিচার করতে গেলে বলা যায়, এই সাদৃশ্যগত প্রভাবের প্রসঙ্গে 'ঞ' হরফটির প্রভাব সম্ভবত সবচেয়ে বেশি। এই প্রসঙ্গে দুটি কথা প্রথমেই মনে রাখা প্রয়োজন। (১) বর্তমান কালের তুলনায় প্রাচীন বাংলা পুঁথিতে 'ঞ' হরফের ব্যবহার ছিল অনেক বেশি। কারণ তখন ইয়া-অন্ত অসমাপিকায়, যেমন করিয়া (করিঞা), দিয়া (দিঞা), লইয়া (লইঞা) ইত্যাদিতে 'ঞ' হরফের ব্যবহার ছিল সর্বত্র। এছাড়া 'য়' নির্দেশ করতেও 'ঞ' হরফের বহুল ব্যবহার ছিল। যেমন নয়ান (নঞান), মায়া (মাঞা), লয়া (লঞা), দয়া (দঞা) ইত্যাদির ক্ষেত্রে। আবার 'ই' নির্দেশ করতেও 'ঞ'-এ 'ই'-কার ব্যবহারের উদাহরণ মেলে। যেমন মুই (মুঞি), কাহ্নাই (কাহ্নাঞি) ইত্যাদি। (২) (ঞ) এর আকৃতিগত প্রভাবেই পঞ্চদশ শতকের (ষ্ন) ক্রমান্বয়ে পরিবর্তিত হতে হতে অষ্টাদশ শতকে এসে, রূপ লাভ করেছে। বস্তুত এই 'ঞ' হরফটির অবয়বগত প্রভাবেই একীভবন প্রক্রিয়া একেবারে শেষ পর্যায়ে সার্থকতায় উন্নীত হয়েছিল। প্রাচীন বাংলা পুঁথিতে বহু ব্যবহৃত এই 'ঞ' হরফটি বারংবার লিপিবদ্ধ করবার অভ্যস্ততাজনিত পূর্ব অভিজ্ঞতা, সংশ্লিষ্ট লিপিকরের অবচেতন মনে প্রাথমিকভাবে একীভূত শব্দগঠনের ভূমি-প্রস্তুতের কাজটি আগেই সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল। না হলে এগুলির একীভূত অবয়ব আদৌ সৃষ্টি হত কিনা সন্দেহ। কেননা আমরা দেখেছি 'প্রভু' শব্দটি যেখানে এইভাবে লেখা হয়েছে সেখানে তা কোনোক্রমেই একাঙ্গীভূত হবার সম্ভাবনা থাকে নি। কিন্তু প্রভু যেখানে 'ঞ' হরফের প্রভাবকে স্বীকার করে এইভাবে লেখা হয়েছে, সেখানেই তা একীভূত রূপ লাভ করেছে। কারণ তার সূচনা বা জমি-প্রস্তুতের কাজ তখনই হয়েছিল যখন 'ঞ' হরফের প্রভাব তার মধ্যে কার্যকর হয়ে অবয়বে পরিবর্তনের সূচনা দেখা দিয়েছিল। তা না হলে হয়তো প্রাথমিক রূপ (Initial Form) থেকে কেবল খানিকটা পরিবর্তিত হয়েই, সংশ্লিষ্ট মূল শব্দসমূহের সংকোচন প্রক্রিয়া সীমিত হয়ে থেকে যেত। নীচের দুটি উদাহরণে এই 'ঞ' হরফটির পাশাপাশি দুটি একীভূত শব্দ রেখে বিষয়টি লক্ষ করা যেতে পারে। এখানে বিভিন্ন পুঁথি থেকে সংগৃহীত শব্দদুটির একীভবন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন স্তরবিন্যাস তুলে ধরা হল।[২৮]

১) কৃষ্ণ >

২) প্রভু >

এখানে একটু লক্ষ করলেই দেখা যাবে 'ঞ'-এর সাদৃশ্য, সংশ্লিষ্ট লিপিকরের অবচেতন মনের আকর্ষণ কীভাবে একীভূত শব্দের প্রথম পর্যায়ের 'ষ্ণ' এবং 'ভূ' পরবর্তী পর্যায়ে স্ব স্ব গন্তব্যে গিয়ে পৌঁছেছে। এইভাবেই সংশ্লিষ্ট মূল ও অবিকৃত শব্দগুলি বিভিন্নরকম পরিমাণগত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে, এক সময়ে গুণগতভাবে পরিবর্তিত হয়ে একীভূতভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। একীভূত শব্দগুলির জন্ম-ইতিহাসে তাই সাদৃশ্যজনিত পরিবর্তন-ক্রিয়ার বিষয়টি অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে মেনে নিতে হয়। সংশ্লিষ্ট লিপিকরের অবচেতন মনের সাদৃশ্যগত ক্রিয়ায় গড়ে ওঠা এইসব শব্দকে এক হিসেবে, শব্দের অবয়বগত বিকৃতি বলা যেতে পারে। যে বিকৃতি এদের অপরিচিত ও দুর্বোধ্য করে তুলেছে। আর এই অপরিচয়ের আড়ালেই এই বিকৃতিপরায়ণ ক্রিয়া নির্বিবাদে সক্রিয় থাকতে সক্ষম হয়েছিল। এবং লিপিকরের অবচেতন মনের সাদৃশ্যঘটিত তৃপ্তি চরিতার্থ হতে পেরেছিল। যদিও তা আকস্মিক নয় এবং একটি সুনির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক পথেই এর যাত্রা সীমিত। তা না হলে এই অবয়বগত বিকৃতি, শুধুমাত্র কয়েকটি নির্দিষ্ট শব্দের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থেকে তা অন্যত্রও আত্মপ্রকাশ করতে পারত।

লিপিগত বৈশিষ্ট্য : বাংলা লিপির বিবর্তনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এইসব একীভূত শব্দের সৃষ্টি যে খানিকটা পশ্চাৎ যাত্রার ফল, একথা অনুমান করা যায়। কতকগুলি দ্ব্যক্ষর (disyllabic) শব্দ-সংকোচনের মাধ্যমে কালক্রমে ও ধাপে ধাপে একীভূত হয়ে এগুলিকে গঠন করেছিল। যেমন নীচের উদাহরণ থেকে কতকগুলি শব্দের ক্রম বিবর্তনের ধারাটিকে অনুসরণ করতে পারা যাবে।

১. প্রভু >

২. কৃষ্ণ >

৩. কুণ্ড >

এখানে 'কালক্রমে' ও 'ধাপে ধাপে' কথাটির গুরুত্ব খুব বেশি। কারণ যেহেতু কোনোরকম যান্ত্রিক পদ্ধতিতে একীভূত শব্দগুলির সৃষ্টি হয়নি, সেহেতু এগুলি হঠাৎ একদিনেও গড়ে ওঠেনি। তাই বলা যায়, কালক্রমে, ধাপে-ধাপে বিভিন্ন লিপিকরদের বিবিধ চিন্তা ও আসক্তির কারণও এদের সৃষ্টিতে সাহায্য করেছিল।

লিপিবিদ্যার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, আধুনিক ধ্বনি, বর্ণ বা

অক্ষরমূলক লিপিগুলি কোনো একদিনে হঠাৎ জন্মলাভ করেনি। আবহমানকালের মানুষের সুচিন্তিত সুশৃঙ্খল মানস-কৃতির (Intellectual activities)-ই কালজয়ী ফল এগুলি। গুহাচিত্র থেকে চিত্রলিপি (Pictogram), তারপরে ভাবলিপি (idiogram)-র পর্যায় অতিক্রম করে, বস্তুর প্রতিকৃতি সংক্ষিপ্ত বা সাঙ্কেতিক হয়ে শব্দলিপি (Lagogram)-র উন্মেষ ঘটেছিল। আর এই শব্দলিপির স্তরের সঙ্গে, আমাদের আলোচ্য একীভূত শব্দের কতকগুলি বৈশিষ্ট্যগত মিল সহজেই চোখে পড়ে। প্রথমত লিপিবিবর্তনের ফলে প্রতিটি বস্তুচিত্র যেমন একটি বিশেষ চিহ্নে রূপান্তরিত হয়ে শব্দলিপিতে পরিণত হয়েছিল, সেক্ষেত্রে উক্ত বিশেষ চিহ্নের সঙ্গে যেমন সংশ্লিষ্ট বস্তুচিত্রের কোনো মিল থাকেনি, তেমনি একীভূত শব্দগুলির ক্ষেত্রেও দেখা যায় স্ব স্ব মূল শব্দের সঙ্গে একীভূত শব্দের চক্ষুগ্রাহ্য রূপের মধ্যেও একটা বড়ো পার্থক্য সূচিত হয়েছিল। কারণ আলোচ্য একীভূত শব্দগুলি মূলত গঠিত হয়েছিল পূর্ণাঙ্গরূপে লিখিত দ্ব্যক্ষর (Disyllabic) শব্দের গুণগত রূপান্তর ঘটার মাধ্যমে।

দ্বিতীয়ত, 'শব্দলিপি'তে ভাষায় ব্যবহৃত প্রতিটি শব্দের জন্য একটি করে চিহ্ন ব্যবহৃত হত। আলোচ্য এক-একটি একীভূত শব্দও মূলত এক-একটি পূর্ণাঙ্গ শব্দের পরিবর্তেই লেখা হত। অনেকটা যেন প্রতীক চিহ্নাকারে লেখা।

তৃতীয়ত, শব্দলিপির বৈশিষ্ট্য হল, ভাষার অন্তর্গত প্রতিটি শব্দের জন্য একটি করে চিহ্নের ব্যবহার। পরবর্তীকালের অক্ষরলিপি (Syllabogram)-র বৈশিষ্ট্য হল এই স্তরে বিভিন্ন চিহ্ন, উক্ত শব্দের সমগ্র ধ্বনিসমষ্টিকে না বুঝিয়ে, বিভিন্ন অক্ষরকে নির্দেশ করত। একীভূত শব্দগুলিও যে কালক্রমে গঠনগত দিক থেকে অক্ষরের মর্যাদা লাভ করেছিল, তারও প্রমাণ পাওয়া যায় পুঁথির পাতায় এদের ব্যবহারের মধ্য দিয়ে। তবে সেক্ষেত্রেও তা শ্রুতিগত দিক থেকে সংশ্লিষ্ট শব্দের সমগ্র ধ্বনিসমষ্টিকেই নির্দেশ করছে। যেমন (কৃষ্ণের), (কৃ কৃষ্ণ) (কৃষ্ণে) (কৃষ্ণেক) (কৃষ্ণক), (কৃষ্ণা) ইত্যাদি একীভূত শব্দগুলির ক্ষেত্রে (কৃষ্ণ) একটি 'সিলেবল' রূপেই লিখিত হয়েছে। কেননা এখানে এর সঙ্গে কোথাও 'এর' বিভক্তি (আগে ে-কার চিহ্ন ও পরে 'র') যুক্ত হয়ে, কোথাও ে-কার বা ি-কার যুক্ত হয়ে এর 'সিলেব্‌ল' রূপে ব্যবহারকে সুস্পষ্ট করেছে। তবে তা উচ্চারণে 'কৃষ্ণ' শব্দের সমগ্র ধ্বনিসমষ্টিকেই নির্দেশ করেছে। কিন্তু এইভাবে একটি সম্পূর্ণ 'সিলেব্‌ল' বা অক্ষর-রূপে স্বাতন্ত্র্যলাভের আগেই, অর্থাৎ লিপিবিবর্তনের পরবর্তী ধাপ বর্ণলিপি (Alphabetic writing)-র পর্যায়ে উত্তীর্ণ হওয়ার আগেই, এই একীভূত শব্দগুলির বিবর্তনধারা অবরুদ্ধ হয়েছিল। এবং সেটাই ছিল স্বাভাবিক। কারণ ধ্বনি, বর্ণ ও অক্ষরমূলক বাংলা লিপিতে,

পূর্ণাঙ্গ রূপে লিখিত একটি দ্ব্যক্ষর শব্দের আকৃতি ও প্রকৃতিগতভাবে একক অক্ষর-এ পরিণত হওয়াকেই আমরা 'পশ্চাৎ যাত্রা' বলে অভিহিত করতে পারি। এবং এটি চূড়ান্ত রকমের প্রগতি-বিরোধী ঘটনা বলে স্বাভাবিকভাবেই এর যাত্রাপথ অবরুদ্ধ হয়েছিল।

বর্ণাত্মকভাবে লিখিত বিভিন্ন পূর্ণাঙ্গ শব্দ-সংকোচনের মাধ্যমে, একীভূত শব্দে রূপ লাভ করেছিল। এদের কোনো কোনোটির ক্ষেত্রে দেখা যায় স্বরূপত এবং অবয়বত যেসব মূল শব্দ ছিল পরস্পর থেকে পৃথক, সেগুলিই এক পর্যায়ে এসে অভিন্ন একীভূত রূপ পেয়ে গেছে। যেমন একীভূত (কৃষ্ণ) এবং একীভূত (কুণ্ড)-র মধ্যে আকৃতিগত কোনো পার্থক্য নেই। আবার অনেক সময়েই দেখা যায় এগুলি যেন বিশেষভাবে চীনা লিপির মতোই দর্শনেন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভাষা। যেমন পূর্বোক্ত একীভূত 'কুণ্ড' এবং 'কৃষ্ণ'-র উল্লেখ করা যায়। কুণ্ড শব্দটি অবয়বে কৃষ্ণ শব্দের সঙ্গে অভিন্ন হলেও, কুণ্ড পদাংশটি যখন 'ল' সংশ্লিষ্ট (অর্থাৎ কুণ্ডল), তখন এটিকে কুণ্ডল বলে ধরে নিতে অসুবিধা হয় না। আবার পরবর্তীকালে এইসব একীভূত শব্দগুলি কোনো কোনো ক্ষেত্রে অবয়বে একক যুক্তবর্ণ, অর্থাৎ একাক্ষরিক পদ হিসেবে ব্যবহৃত হতেও দেখা যায়। এগুলিও যে একাধিক ধ্বনিযোগে গঠিত এবং এক-একটি ধ্বনির পরিবর্তে যে এক-একটি বর্ণ ব্যবহৃত হতে পারে, সংশ্লিষ্ট অনেক লিপিকরই যেন তা ভুলতে বসেছিলেন। উদাহরণ হিসেবে পূর্বোক্ত (কৃষ্ণে), (কৃষ্ণেক) ইত্যাদির কথা উল্লেখ করা যায়। এই প্রসঙ্গে একথা স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা যায় যে একীভূত (কৃষ্ণ) শব্দটিকে বর্ণাত্মকভাবে লিখবার ধারণা যেমন সংশ্লিষ্ট লিপিকরদের মন থেকে লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, অন্যদিকে আবার তেমনি (কৃ কৃষ্ণ) শব্দগঠনের প্রাচুর্য দেখে বোঝা যায় যে লিপিকর বর্ণাত্মকভাবে কৃষ্ণ শব্দটি লিখতে গিয়েও (কৃষ্ণ)-কে বাদ দিতে পারেনি। অর্থাৎ কৃষ্ণ শব্দটির সঙ্গে তার এই একীভূত নব অবয়বের দৃষ্টিগত রূপটি এমনভাবে লিপিকরদের মনে মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছে, অথবা এই শব্দের দীর্ঘ অভ্যস্ততা-জনিত প্রতিক্রিয়ায়, কৃষ্ণ শব্দটিকে বর্ণাত্মকভাবে লিখতে গিয়েও, তার সঙ্গে একীভূত কৃষ্ণকে জুড়ে দিয়ে (কৃ কৃষ্ণ) জাতীয় এক অভিনব শব্দের জন্ম দিয়ে বসেছেন।

স্থায়িত্বের কারণ বিচার : সপ্তদশ শতক থেকে ঊনবিংশ শতক পর্যন্ত লিপিকৃত বহু পাণ্ডুলিপিতে, আলোচ্য একীভূত শব্দের নিদর্শন প্রচুর পরিমাণেই পাওয়া যায়।

এমনকি পূর্বোক্ত একীভূত শব্দগুলির কোনো কোনোটির সাদৃশ্যগত প্রভাবে আরও কিছু কিছু নতুন নতুন একীভূত শব্দের নিদর্শনও কোনো কোনো পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া যায়।

আবার সংশ্লিষ্ট লিপিকরদের মধ্যে একীভূত (কৃষ্ণ)-রূপ এমন মজ্জাগত হয়ে গিয়েছিল যে, অনেক সময়েই দেখা গেছে যে লিপিকর বর্ণাত্মকভাবে কৃষ্ণ শব্দটি লিখতে গিয়েও একীভূত কৃষ্ণকে বর্জন করতে না পেরে অবচেতনভাবেই লিখে ফেলেছেন (কৃ কৃষ্ণ)। অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালের বাংলা চিঠিপত্র, কুলপঞ্জী, অভিযোগপত্র, চুক্তিপত্র ইত্যাদিতে ব্যক্তিনাম সংশ্লিষ্ট 'কৃষ্ণ' শব্দটির একীভূত রূপের ব্যাপক প্রচলন দেখা যায়। সুতরাং বাংলা লিপিতে একীভূত শব্দগুলি যে বেশ কিছুকাল ধরেই স্থায়িত্ব লাভ করেছিল একথা মেনে নিতে হয়।

একীভূত শব্দের স্থায়িত্ব লাভের অন্যতম প্রধান কারণ চোখের অভ্যস্ততাজাত পরিতৃপ্তি ও পরিচিতি। এই শব্দগুলি যখন চক্ষু-পরিতৃপ্তিমূলক অতীত অভিজ্ঞতা, তখন তা ছিল সহজ, স্বচ্ছন্দ ও স্বাভাবিক ব্যবহারের স্বীকৃতিমণ্ডিত।

লেখ্যরূপ হিসেবে এগুলি সমকালীন বাঙালির চোখে পরিচিত ও অভ্যস্ত বিষয় হয়েছিল বলেই, লিপিগত ঐতিহ্যের অঙ্গীভূত এইসব শব্দ বাংলা লিপিতে অনেকদিন পর্যন্ত জায়গা করে নিতে পেরেছিল। কারণ প্রত্যেক ভাষার শব্দাবলীরই দুটি রূপ। একটি শ্রুতিগত অপরটি চক্ষুগ্রাহ্য। শব্দের এই চক্ষুগ্রাহ্য চেহারা, তা সে বিজ্ঞান-ভিত্তিক হোক বা না হোক, মানুষ একবার তা মেনে নিলে সহজে তার পরিবর্তন হওয়া সম্ভব নয়। মানুষের বদ্ধমূল সংস্কারে আঘাত লাগে।

একীভূত শব্দের স্থায়িত্বের আর একটি প্রধান কারণ মানুষের সোজা পথ খোঁজার চিরন্তনী স্বভাব। সহজ কিছু হাতের কাছে পেলে মানুষ আর কষ্ট করতে চায় না। কলম না তুলে টানা লিখবার যে প্রবণতা থেকে একীভূত শব্দের জন্ম, সেই প্রবণতাই আবার এদের স্থায়িত্বেরও অন্যতম কারণ।

মানুষের মনের সহজাত সাম্যবোধ, যা একে জন্ম দিয়েছে, সেই সাম্যবোধই একে স্থায়িত্বও দিয়েছে। এছাড়া এই শব্দগুলির গঠনক্রিয়ার মাধ্যমে লিপিকরের যে তৃপ্তি বা আনন্দ জড়িয়ে রয়েছে, তা এদের স্থায়িত্বের পথও প্রশস্ত করেছিল। বিভিন্ন পুঁথির পাতায় পাতায় ছড়িয়ে থাকা এই সব শব্দ লক্ষ করে দেখা গেছে, যে লিপিপ্রমাদ পুঁথির পাতায় একটি সহজ স্বাভাবিক ঘটনা, সেই লিপিপ্রমাদ কিন্তু এই সব একীভূত শব্দের ব্যবহার-ক্ষেত্রে বিশেষ দেখা যায় না। কারণ লিপিপ্রমাদ ঘটে লেখায় অনীহা বা বিরক্তি থেকে। কিন্তু একীভূত শব্দগঠনে যেহেতু লিপিকরের মানসিক আনন্দ, তাই সেখানে অনীহাজনিত প্রমাদও দুর্লভ। এটাই স্বাভাবিক।

বিলুপ্তির কারণ : লিপিবিবর্তনের ধারায় একীভূত শব্দের জন্মের পরে বেশ কিছুকাল কেটে গেলেও, বাংলা লিপিতে তা চিরস্থায়ী আসন করে নিতে পারেনি। এর প্রধান কারণ হিসেবে বিবর্তনধারায় এর পশ্চাৎ যাত্রার প্রসঙ্গ আগেই বলা হয়েছে। প্রকৃতির স্বাভাবিক ধর্মে জগৎ ও জীবন সবসময়ে সামনের দিকেই এগিয়ে চলে। কোনো কারণে তার অন্যথা ঘটলে, তাকে ব্যতিক্রমই বলতে হবে। আর যে-কোনো ব্যতিক্রমই সাময়িক ব্যাপার, তা কখনও চিরস্থায়ী হতে পারে না।

আকৃতিতে এক-একটি যুক্তবর্ণ হলেও, প্রকৃতপক্ষে এই শব্দগুলি মোটেই তা নয়। এদের মধ্যে সম্পূর্ণ দুটি পৃথক 'সিলেব্‌ল'কে একীভূত করে ঠাসাঠাসিভাবে ঢুকিয়ে রাখা হয়েছে। যা সম্পূর্ণভাবেই সমকালীন বাংলা লিপির প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। এদের অবয়বগত এই বৈশিষ্ট্যই অন্যান্য সাধারণ যুক্তবর্ণের থেকে এদের পৃথক করেছে। এই কারণে পরবর্তীকালে এক-একটি একীভূত শব্দের অবয়ব এবং সংশ্লিষ্ট ধ্বনিচিন্তার মাঝখানকার পরিমাণগত বৈষম্যটি মুক্তদৃষ্টি লিপিকরের কাছে সুচিহ্নিত হয়ে পড়েছিল। ফলে এগুলির ব্যবহার-যোগ্যতা সম্পর্কে দ্বিধা দ্বন্দ্ব এবং সেই সঙ্গে অনীহাও জন্মলাভ করেছিল। এই পথেই এদের বিলুপ্তি ত্বরান্বিত হয়েছিল।

এদের বিলুপ্তির দ্বিতীয় কারণ হল, ভিন্ন ভিন্ন অবয়ববিশিষ্ট একাধিক মূল শব্দের অভিন্ন একীভূত-রূপে পরিণতি। কারণ এর ফলে পুঁথির পাঠোদ্ধারের ক্ষেত্রে দেখা দিয়েছিল অনাবশ্যক জটিলতা। যেমন 'কৃষ্ণ' ও 'কুণ্ড' এই দুটি শব্দই একাঙ্গীভূত হবার পরে অভিন্ন আকার   ধারণ করেছিল। যা সমগ্র বাক্যের অর্থের সঙ্গে মিলিয়ে না দেখলে, অনেক সময়েই এদের সঠিক পাঠোদ্ধার বা শনাক্তকরণ প্রায় অসম্ভব। যেমন উদাহরণ হিসেবে নিম্নোক্ত পদটি দেখা যায়

(শ্রী রঘুনাথ গোশাঞি বন্দো রাধা কুণ্ড বাশী)। এখানে 'রাধাকুণ্ড' শব্দটিকে বাক্য থেকে পৃথক করে নিলে এটি 'রাধাকুণ্ড' হবে অথবা 'রাধাকৃষ্ণ' হবে তা নির্ণয় করা সহজ নয়।

তবে এই একীভূত শব্দগুলি বাংলা লিপিতে দলছাড়া গোত্রছাড়া হলেও, লিপি-ইতিহাসের বিবর্তনধারার পরিপ্রেক্ষিতে একেবারে সৃষ্টিছাড়া কোনো কিছু অবশ্যই নয়।

একীভূত শব্দগুলির একটি ঐতিহ্য বা ইতিহাস আছে। বাঙালির সমাজ-মনে এগুলি চিত্র অথবা বিমূর্ত ভাবের প্রতীক হিসেবে একসময় স্বীকৃতি পেয়েছিল। আবার কালক্রমে তা লুপ্তও হয়ে গেছে। আধুনিক বাংলা বানানে যে সমস্ত অস্বচ্ছ যুক্ত ব্যঞ্জনকে বর্জন করে সরল বা স্বচ্ছ রূপ দান করবার প্রস্তাব চলছে, তা সর্বত্র অনুসৃত হলে, আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আবার এই সব বর্জিত যুক্ত ব্যঞ্জনগুলির উৎপত্তি, স্থিতি ও বিলুপ্তির ইতিহাস নিয়ে মাথা ঘামাবেন।

পুঁথির লিপিকলার বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য বিষয়ের সামান্য ভগ্নাংশ মাত্র এখানে ছুঁয়ে যাওয়া হল। প্রতিটি বর্ণের, যুক্ত বর্ণের, বিবর্তনের ইতিহাস আলোচনায় আমরা এখনও শৈশব উত্তীর্ণ হইনি। সব ইতিহাস যদি কোনোদিন জানা সম্ভব হয়, সেদিন বাংলা লিপি ও তার বিবর্তনের ইতিহাস নতুন করে লেখা হবে। কিন্তু অসীম ধৈর্য, পাণ্ডিত্য ও অধ্যবসায় নিয়ে কোন্ মহাক্ষণে কোন্ মহাপণ্ডিত এগিয়ে আসবেন, আমাদের জানা নেই। কিন্তু তবু আমরা তাঁর পদধ্বনি শোনবার প্রতীক্ষায় বসে আছি।

তথ্য-নির্দেশ

১. অশোকের গির্নার পর্বতের প্রথম শিলালিপির চিত্র থেকে গৃহীত।

২. ননীগোপাল মজুমদার, 'বুদ্ধগয়ার দুইখানি শিলালিপি'— 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা', ১ম সংখ্যা ১৩২৩, পৃ. ৭০।

৩. 'কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে' সংরক্ষিত পুঁথি। ডক্টর তারাপদ মুখোপাধ্যায়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

৪. 'রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল'-এ সংরক্ষিত পুঁথি, সংখ্যা ৯৯৯৫।

৫. 'এশিয়াটিক সোসাইটি'তে সংরক্ষিত।

৬. 'কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে' সংরক্ষিত পুঁথি। ডক্টর তারাপদ মুখোপাধ্যায়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

৭. 'এশিয়াটিক সোসাইটি'তে সংরক্ষিত।

৮. অনুস্বার বিন্দু কেন অনুস্বার বৃত্তে পরিণত হল, এর কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে দু-একটি প্রাচীন পুঁথির লিপির কথা মনে হতে পারে। এদের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করা যায়, বিশ্বভারতী পুঁথি বিভাগে সংরক্ষিত 'গোপাল বিজয়'-এর পুঁথিখানি। আলোচ্য পুঁথিখানির লিপি কলা পরীক্ষা করলে দেখা যায়, সেখানে 'র' হরফটি সর্বত্র লেখা হয়েছে, র্ (র) এইভাবে। আর 'ব' হরফটি লেখা হয়েছে 'ব'-এর মতো করে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত অনেক প্রাচীন পুঁথিতেও এই লিপিধারা অনুসৃত হতে দেখা যায়। এসব ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, অনুস্বারকে পূর্বস্থিত বর্ণের মাথায় বিন্দুর আকারে নির্দেশ করলে 'র'-এই বর্ণের শেষ পর্যন্ত 'বং' হবার সম্ভাবনা থেকে যাচ্ছে। সম্ভবত এই কারণেই উক্ত পুঁথিগুলিতে অনুস্বার বৃত্তাকার। কিন্তু পূর্ববর্তী কোনো কোনো পুঁথিতে 'র' হরফ-এর এই অভিনব রূপটি অবশ্যই 'রং'-এর সঙ্গে ভিন্নাকার হয়ে লিপিকরের মনঃপীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অনুস্বারের বিবর্তন ধারার বিন্দু থেকে বৃত্তে পরিণতির এটাও একটা কারণ হতে পারে।

৯. ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে এই পুঁথি, "১৩৮৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে লিখিত হইয়াছিল" ('শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুঁথির লিপিকাল', বসন্তরঞ্জন রায় সম্পাদিত, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-এর ভূমিকার অন্তর্গত, (১৩৫৬) পৃষ্ঠা ১দ√.।
ডক্টর নলিনীকান্ত ভট্টশালীর মতে, এর লিপিকাল ১৪৬৬ খ্রিস্টাব্দের পরবর্তী। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে এর সময় ১৪৫৯-১৫০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী। ডক্টর সুকুমার সেনের মতে এর লিপিকাল, 'অষ্টাদশ শতকের শেষার্দ্ধ' (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, পূর্বার্দ্ধ, পৃ. ১৩৫)। এস. এন. চক্রবর্তীর মতে, 'লিপিতত্ত্ব বিচারে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন অবশ্যই পঞ্চদশ শতাব্দীর পুঁথি বোধিচর্যাবতার

(১৪৩৫ খ্রি.) এর সমসাময়িক' [Developments of the Bengali Alphabet from the 5th Cuntury A. D. to the end of the Mohamedon rule, J. R. A. S. B.– 1908, Vol. IV. Page 35.]

মোহাম্মদ আবদুল কাইউম, এস. এন. চক্রবর্তীর এই মত সমর্থন করে বলেন, "শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের লিপির সাথে 'বোধিচর্যাবতার' পুঁথির লিপি মিলিয়ে দেখলে একথা স্পষ্ট হবে যে, দুটি পাণ্ডুলিপিই সমসাময়িক অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের লিপিকাল পঞ্চদশ শতাব্দীতেই" (পাণ্ডুলিপি পাঠ ও পাঠ সমালোচনা, পৃ. ১১৭-১৮)। আবার ডক্টর তারাপদ মুখোপাধ্যায়, এর লিপিকাল, 'সপ্তদশ শতকের পূর্ববর্তী নয়' বলেই অনুমান করেন। ('শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' পুঁথির পুষ্পিকা, বিশ্বভারতী পত্রিকা, ৩০ বর্ষ, ৩-৪ সংখ্যা পৃষ্ঠা–

১০. ডক্টর তারাপদ মুখোপাধ্যায়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

১১. গোপাল বিজয়, কবিশেখর, বিশ্বভারতী সংগ্রহ।

১২. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ, সংখ্যা ৭৫২, পৃ. ৮৩ ক।

১৩. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ, সংখ্যা ৬৩৬২, পৃ. ৩ ক-৩ খ।

১৪. অবশ্য যে সব পুঁথিতে 'ি'-কার-এর চৈতনটি ঠিক অতখানি ছত্রাকার হয়ে বেড়ে ওঠেনি, যতখানি হলে তা পরস্থিত বর্ণটির উপরিভাগের সমগ্র অঞ্চলটুকুই একেবারে ঢেকে ফেলতে, তথা দখল করে নিতে পারে, (অর্থাৎ 'ি'-কারের সংক্ষেপায়তন ছত্রাংশ) সে সব ক্ষেত্রে বাস্তব অসুবিধা দেখা না দেওয়ায়, অনুস্বার বৃত্তের অবস্থানগত কোনো পরিবর্তন দেখা দেয়নি। যেমন— বিংশ (বিংশ), সিংহ (সিংহ) ইত্যাদি।

১৫. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পুঁথি, সংখ্যা ৬৭০৪ পত্র ৪৫ ক, পুঁথি সং ৬৩৬৭ পত্র ২৪ ক, ২৪ খ সং ৬৭০০ পত্র ৪ক, ৪খ সংখ্যা ৬৮৭৮ পত্র ৩৬৬ খ।

১৬. ঐ সংখ্যা ৬৮৫৯, ৩০৯৮, ৩৮৭৭ ১০৪৪ এবং ১০৪১।

১৭. সুতরাং বলা যায় শব্দ বা পঙ্‌ক্তিস্থিত অন্যান্য হরফের কিংবা যুক্তবর্ণের অনুষঙ্গে না দেখে, সম্পূর্ণ পৃথকভাবে একটি হরফের কালগত বিবর্তন ধারা যে সম্যকভাবে উপলব্ধি করা যায় না, তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এই বাংলা অনুস্বার হরফটি।

১৮. বাংলা অক্ষরের প্রত্যেকটির উপর মাত্রা না থাকলেও অধিকাংশের উপর আছে। এই মাত্রাই অক্ষরের উচ্চতার মাপ (যদিও অক্ষরের সমতা রক্ষা ছাড়াও মাত্রার অন্য গুরুত্ব আছে। ত্র । এ, ন্ত । ও প্রভৃতির পার্থক্য মাত্রার দ্বারাই সূচিত হয়)। অক্ষরের নিম্নভাগের সমতা রক্ষার জন্য 'মাত্রা' নেই। কিন্তু অক্ষরের গঠন-বৈশিষ্ট্য আলোচনায় নিম্নভাগের গুরুত্ব ঊর্ধ্বভাগের চেয়ে কম নয়। আলোচনার সুবিধার জন্য অক্ষরের নিম্নভাগে একটি 'নিম্নমাত্রা' কল্পনা করে সেটির নাম দেওয়া হয়েছে 'ভূমি'।" ডক্টর তারাপদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, পৃষ্ঠা-২৮, পাদটীকা-৫)।

১৯. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক পুঁথিতেই আমরা 'র' হরফের এই প্রাচীন রূপ দেখতে পাই। এই ধরনের অনেক হরফই আধুনিক বাংলা লিপি থেকে বিদায় নিয়েছে। কিন্তু এগুলিও সমকালীন অপরাপর হরফের পাশাপাশি ব্যবহৃত হয়ে লিপি জগতে তাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও ভূমিকা বজায় রেখেছিল।

২০. এখানে একটি কথা বলা একান্ত প্রয়োজন যে, আমরা এখানে অশোকের ব্রাহ্মীলিপির সময় থেকে

আধুনিক বাংলা লিপিতে পৌছানো পর্যন্ত সময়সীমার অনুস্বার হরফের বিবর্তনের ধারাটিকে সাধারণভাবে লক্ষ করবার চেষ্টা করেছি মাত্র, বিবর্তনের কালানুক্রমিক পুঙ্খানুপুঙ্খ ইতিহাসকে নয়। কারণ সে ইতিহাস রচনা করতে গেলে যে সময় এবং পরিশ্রম করা প্রয়োজন, তা এখানে অবশ্যই দাবি করা যায় না। তবে বিবর্তনের এই ধারাটিকে সাধারণভাবে অনুসরণ করতে গিয়ে, বিবর্তনের ইতিহাসের একেবারেই ধারেকাছেও পৌছানো সম্ভব হয়নি, এমন কথাও বলা চলে না।

২১. এই তির্যক রেখাটিকে 'নির্ধারক চিহ্ন' হিসাবে উল্লেখ করবার কারণ, এটি উচ্চারণে অনুচ্চার্য, অথচ হরফটির স্পষ্টরূপ তথা পরিচয় নির্ধারণে সহায়ক।

২২. A word shortened by rejecting a part of it.

২৩.

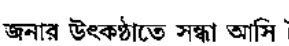

(দুই জনার উৎকণ্ঠাতে সন্ধা আসি হৈল।)

(জআদ্বৈত চন্দজয় গৌউর ভক্তবৃন্দ)

২৪.

(আনিয়া চৈতন্য চন্দ্রে উদ্ধারিলা ত্রিভুবনে পরম পাষণ্ডী পাপী মূঢ়।)

(কেহঁ কহে পরম ভাগবত কেহঁ কহে পরম উত্তম দ্বিজরাজ।)

২৫.

(ডুবু ডুবু করে আখি প্রেমের সাগরে।)

(আনহ ডাকিয়া দেখি কেমন ফকির।)

২৬. বাংলা পাণ্ডুলিপি পাঠ সমীক্ষা গ্রন্থে মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া এরকম দুই একটি দুর্লভ উদাহরণ সংগ্রহ করেছেন। পৃ ১১২-১৩ এবং ১২৬-২৭ দ্রষ্টব্য।

২৭. ডক্টর সুকুমার সেন—ভাষার ইতিবৃত্ত, ১৯৭৫, পৃষ্ঠা ৪৭-৪৮।

২৮. এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলা প্রয়োজন যে, এমন অনেক পুঁথি রয়েছে, যেখানে এই বিশেষ শব্দগুলি সর্বত্রই একীভূত রূপে লিখিত হয়েছে। কোথাও-বা এর একীভবনের বিভিন্ন স্তরের রূপ প্রকাশ পেয়েছে। আবার অনেক পুঁথিতেই একই সঙ্গে একীভূত রূপ ও বিশ্লিষ্ট সাধারণ রূপ, বা পূর্ণাঙ্গ রূপে লিখিত দ্বক্ষ্যর শব্দ, তথা বর্ণনাত্মক রূপ পাশাপাশি বিরাজ করছে। বিশেষ করে কৃষ্ণ ও প্রভু এই শব্দদুটির ক্ষেত্রে একথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য।